বকেয়া

– তরুণ বড়ুয়া

বয়স তখন চোদ্দ পনেরো।

খবরের কাগজ থেকে *চুলের কুটুম রঙিন ফিতা, আমার কুটুম মিষ্টি মিতা, হাতের কুটুম রঙিন চুড়ি, বয়স যদি ঊনিশ কুড়ি*–এ জাতীয় একটা ছড়া লিখে পড়ার টেবিলে রেখেছিলাম।

ছড়াটা মায়ের হাত হয়ে বাবার হাতে গেল। এ বয়সে এতোসব! বলে বাবার কড়া শাসনে এক পা পিছু হটলাম।

মনে মনে ভাবলাম, এ ছড়াটা আমার ভালো লাগলো কেন? ছড়াটাতে কি খারাপ কিছু আছে?

যা হোক, বাবার হয় তো পদ্যে এলার্জি, তাই এ রকমটা হলো। ছোট গ্রাম। বিষয়টা এ কান ও কান হয়ে পাড়ার প্রায়ই সবাই জানলো। তখনো ভাবলাম এটা আবার জানাজানির কি হলো?

আসলে পাড়ার ওই মোড়ের আড্ডায় ওদের বাড়ি এই হলো, তাদের ছেলে এ করলো, ওদের মেয়ে ওই বললো এ জাতীয় আলাপই বেশি হয়।

এর কিছুদিন পর পুকুরের পাড় দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম। পাশের বাড়ির মোটা, বেটেখাটো চোখ, ছোট এক মেয়ে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছিল।

একটু থতমত খেলাম।

মেয়েটি ডানে–বামে তাকিয়ে একটা কাগজ মোড়ানো কিছু আমায় লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরে উল্টো চলে গেল। মেয়েটির চোখ একটু বেশি ছোট ছিল বলে হয়তো লক্ষ্য করেনি, একটু দূরেই প্রতিবেশী এক কাকা দাড়িয়ে। কাকা দেখে মুচকি হাসলেন।

কাকাকে দেখেও না দেখার ভান করে কাগজটা কুড়িয়ে নিলাম। চিঠিটার মমার্থ ছিল এই যে, আমি নাকি ভালো ছড়া লিখি, ওকে যেন একটা ছড়া লিখে পাঠাই।

বাবা পরের দিন আবার ডেকে আমার উচ্ছন্নে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে আরো কড়া শাসন করলেন। বুঝলাম, প্রতিবেশী কাকা ও বাবার মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ভালোই হয়েছে। একটা ছড়া লিখে আর পাঠানো হলো না। ছড়াটা বাবার কারাগারে বন্দী হলো। আমার লেখা প্রথম ছড়া এবং মনে জাগা প্রথম ভালোবাসার এখানেই মৃত্যু।

তারপরে জেনেছি, সেই প্রতিবেশী কাকা নাকি আমাকে দেয়া মেয়েটির সে চিঠির সূত্র ধরে ওকে খারাপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাতে রাজি না হওয়ায় তিনি কথাটা পাড়ায় ছড়িয়ে দিলেন।

তাতে মেয়েটারও সামান্য ক্ষতি হয়েছিল। তবে আমি মেয়েটার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সে ক্ষতি পুষিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসার দরজায় হোচট খেলাম।

পাশের গ্রামের আরেকটা মেয়েকে ভালো লাগতো।

মেয়েটা আমাকে দেখে বলেছিল, ছিঃ এতো ছোট ছেলে।

আসলেই আমার সাইজটা বেটেখাটো ও ছোট। তাই বোধ হয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করল।

গুটিয়ে গেলাম। হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। এরপর থেকে আগ বাড়িয়ে কাউকে ভালোবাসার কথা বলিনি। ফলে অনেক ভালোবাসা সুপ্তই রয়ে গেল। তবে অনেককে চিঠিতে ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু নিজের মুখে নয়।

একটা মেয়ে আমাকে রূঢ় বললো, তিমির বললো, দুষ্টু বলল।

রূঢ় কথাটা আমার অপছন্দের হলেও বাকি দুটো আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। আমি সত্যি রূঢ় কি না জানি না। তবে সে কথাগুলোকে আমি সহজভাবে নিয়েছিলাম। সে মেয়েটা খুব ভালো ছিল। ওকে আমার খুব

ভালো লাগতো। সে মেয়েটার বাসা থেকে আমার বাসা এই ঢিল ছোড়া দূরত্বে। ও আমাকে ভালোবাসতো কি না জানি না তবে খারাপ বাসতো না। সামাজিক কারণে হোক, জড়তার কারণে হোক, হীনম্মন্যতার কারণে হোক, ওকেও ভালোবাসার কথাটা বলতে পারিনি।

ইদানীং আমার স্ত্রী আমাকে একই দোষে দোষী করলো।

এখন আমার বয়স চল্লিশ, মেয়ের বয়স দশ।

সেদিন স্ত্রী ক্ষোভ করে আমাকে বললো, আমার কি কখনো শুনতে ইচ্ছে করে না, আমি তোমাকে ভালোবাসি কথাটা।

আমাদের বিয়ের বয়স প্রায় এক যুগ। সত্যিই নিজের স্ত্রীকে কখনো বলিনি যে, *আমি তোমাকে ভালোবাসি*। ইদানীং স্ত্রীর এ কথাটা আমাকে খুব নাড়া দেয়। নিজেকে প্রশ্ন করি, কেন আমি বলতে পারিনি? আমিও কি এ কথাটা কারো কাছ থেকে আশা করতে পারি? নিজে নিজেই উত্তর খুজি। এটা আশা করাটা তো অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু আমিও তো এ কথাটা কারো কাছ থেকে শুনিনি। আমার মা-বাবাও আমাকে খুব ভালোবাসেন। তাদের মুখ থেকেও তো ভালোবাসি কথাটা কখনো শুনিনি। শুনিনি বলে কি ভালোবাসি কথাটা কাউকে বলতে পারি না? তাই আমি আমার স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করি, ব্যাপারটা আসলে মুখের নয়, মনের।

স্ত্রী এসব কথা মানতে রাজি না। সে আমার মুখ থেকেই এ কথা শুনতে চায়।

সে বলে, ভালোবাসি কথাটা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমাদের কাছে খুবই মামুলি। তবুও আমার এটা শুনতে ইচ্ছে করে। আপনজনের কাছ থেকে এটা শুনতে চায় সবাই।

সে আরো বলে, ‘আমাদের মেয়ের বয়স এখন প্রায় দশ বছর। আমরা দুজনে ওকে খুবই ভালোবাসি। অথচ তোমার নিজের মুখে মেয়েটাকে ভালোবাসি কথাটা কখনো বলতে শুনিনি। তুমি যখন ঢাকায় ছিলে তখন চিঠিতে তো ভালোবাসার কথা, ভালোবাসি কথাটা অনেকবার লিখেছিলে। কিন্তু মুখে বলতে তোমার বাধা কোথায়।

বললাম, তুমিও তো আমাকে কখনো বলোনি।

ও বললো, আগে তুমি বলো, তারপর আমি বলবো। আগে ছেলেদের বলতে হয়। প্রায় এক যুগ আগে সেই বাসর রাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব পশ্চিম* বইটা উপহার দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কতো কিছু বলেছো, কতো কিছু করেছো। এই একটি শব্দ *ভালোবাসি* কথাটা শোনার জন্য কতো ব্যাকুল ছিলাম। কিন্তু বলোনি। কেন, কিসের এতো জড়তা?

বললাম, সত্যিই এটা বলা হয়নি। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।

আর ভালোবাসতে হবে না।

আমি লজ্জিত। দেখো, এবার থেকে প্রতিদিন একবার করে বলব। *আমি তোমাকে ভালোবাসি।*

স্ত্রী বললো, প্রতিদিন ভালোবাসি বললে কি ভালোবাসা হয়? যেদিন প্রয়োজন সেদিন বলো। প্রতিদিন নয়।

আচ্ছা আমি তোমাকে ভালোবাসি কথাটার আরো একটু সংক্ষিপ্ত রূপ আনা যায় না। এতো লজ্জা করে কি ভালোবাসার কথা বলা যায়।

স্ত্রী বললো তুমি যেভাবেই বলো, তবে বলতে হবে বকেয়াসহ।

সত্যিই যথেষ্ট বকেয়া পড়েছে, দেখি! আমার বকেয়ার কি হয়। এদিকে ক্রস কানেকশন, দুমাসের টেলিফোন বিলও বকেয়া।

স্ত্রী বললো, বকেয়া বেশি হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় জানো তো। তাড়াতাড়ি পরিশোধের ব্যবস্থা করো।

রামু, কক্সবাজার থেকে

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

– রোমিও

তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।

হ্যা, আমি মমকে নিয়েই আজ ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার গল্প রচনা করবো। মম আমার পরকীয়া প্রেমিকার নাম। আমরা একই এলাকার সামনা–সামনি দুটি বাড়ির বাসিন্দা ছিলাম। আমি ছিলাম তিন তলায় আর ওরা থাকতো আমাদের সামনের টিনশেডের বাসিন্দা। ওদের ওখানে যাওয়ার পর প্রথম যখন মমকে দেখলাম তখন থেকেই আমার ভেতরে একটা হৃদয়কম্পন হলো। যদিও দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সে বিবাহিতা। কে জানে! আমাকে দেখেও হয় তো ওর ভেতরেও একটা কম্পন তৈরি হয়েছিল বোধহয়। তাই তো আমরা পরস্পর জড়িয়ে ছিলাম। গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম।

ওর স্বামী ছিল ইঞ্জিনিয়ার। ওদের একটা সাত আট বছরের মেয়ে ছিল। কিসের নেশায় জানি না ও প্রায়ই আমার বাসায় ছুটে আসতো। ওর স্বামী যখন অফিসে যেতো তখন অফিস ফাকি দিয়ে বাসায় থাকতে চেষ্টা করতাম আমি। এবং আমার বাসায় অন্যান্য সদস্যরা প্রায়ই দেশের বাড়িতে থাকতো। ব্যস এভাবে আমরা সুযোগ তৈরি করে নিতাম। ও যখন আমার কাছে আসতো তখন আর কোন কথাই হতো না শুধু জড়িয়ে ধরে গভীর সমুদ্রে ঝাপ দেয়া ছাড়া! ওহ! কি যে ভালো লাগতো। বিশ্বাস করুন, একদম নেশা ধরে গিয়েছিল। আমার যৌন জীবনের হাতেখড়ি ছিল ওকে দিয়েই।

অবিবাহিত একটা পুরুষ আর বিবাহিতা সুন্দরী এক নারীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা ভাবলেই তো গা শিহরণ করে ওঠে। এবং আমি সেখানে সাতার কাটছিলাম। এটা ১৯৯৯ সালের কথা। আমাদের পরকীয়া প্রেমের তখন শুরু। আমি যখন অফিসে থাকতাম, তখন ছিলাম অস্থির একটা মানুষ! মনটা পড়ে থাকতো মম–র পানে!

এক দিন, দুদিন। তিন দিন। আস্তে আস্তে এলাকার মহিলারা, তারপর পাড়ার মাস্তান–বখাটেরা আমাদের গভীর সম্পর্কের কথা জেনে গেল। পাড়ার ছেলেরা অনেক হুমকি দিতে লাগলো আমাকে। উপায়ান্তর না দেখে টাকা দিয়ে ওদের শান্ত করার চেষ্টা করেছিলাম আমি। মমই আমাকে বলেছিল, ওদের সঙ্গে ঝামেলায় না গিয়ে কিছু টাকা দিয়ে দাও। টাকাতে কাজও হলো।

কিন্তু ১৯৯৯ শেষের দিকে এসে ঝামেলা হলো অন্য জায়গায়। আর সেটা হলো, ডিভি লটারি। হ্যা, ওর স্বামী ডিভি লটারি জিতলেন। সব কিছু ঠিকঠাক হলো, ওরা আমেরিকা চলে যাবে। আমার হৃদয় চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে গেল এই সংবাদে। ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম ওকে বিয়ে করবো। এবং সেও আমার প্রেমে মত্ত ছিল। ও প্রায়ই বলতো, আমার মতো আদর নাকি জীবনে ওকে কেউ–ই করতে পারেনি। ও ছিল আমার প্রেমে পাগলিনী।

কিন্তু সে পাগলামির অবসান করেছিল ডিভি লটারি।

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ও আমেরিকায় চলে গেল। আমি একা পড়ে রইলাম এই জনপদে বিশাল এক নিঃসঙ্গতা নিয়ে। সপ্তাহে একদিন ওকে ফোন করতাম ওর আমেরিকার বাসায়। কথা হতো। ও আমাকে আশ্বাস দিতো ও চলে আসবে। এসে আমাকে বিয়ে করবে। আর এখানে ওর বড় বোনের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিল।

কোনো কিছুতেই আর কিছু হলো না। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়! ও আর ফিরে আসছে না। আমার মনে হলো আমেরিকার মোহ ওকে আমার প্রেম থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। যখন বুঝতে পারলাম, আমার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে তখন নিজেকে নিয়ে আলাদা করে ভাবতে শুরু করলাম।

তারপর বিয়ে করলাম। সংসার করছি। সংসার ও সন্তান নিয়ে এখন বেশ ভালো আছি। আমার বিশ্বাস, সে আমার চেয়েও বেশি ভালো আছে। আমেরিকান জীবনধারা, আমেরিকান সভ্যতা, সংস্কৃতি তাকে আরো সুখী

করতে পেরেছে। এখন আর আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় না। হয় তো এখনো ওদের বাসায় ফোন করলে কথা বলতে পারি। কিন্তু *পুরনো ঘায়ে নুনের ছিটা* দিতে ইচ্ছে হয় না। তবুও মাঝে মাঝে মনে পড়ে, খুব জানতে ইচ্ছে করে, কেমন আছে আমার মম, কেমন আছে আমার জান!

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, ঢাকা থেকে

তিনটা এক মিনি

– নেহাল

ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। সবাই বলে, সবার জীবনে প্রেম আসে, এমনকি একটা জনপ্রিয় গান আছে, *সবার জীবনে প্রেম আসে তাই তো মানুষ ভালোবাসে।* কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম না। এমন সময় এলো বিশ্বাস আমাকে করতেই হলো। যখন বিশ্বাস করলাম তখন নিজেই একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

আমাদের প্রেম ছিল পবিত্র। কিন্তু গত ২২ মার্চ শনিবার আমাদের প্রেম অপবিত্র হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল পবিত্র রাখার, পারলাম না। কথায় আছে, *আগুন আর মোম এক সঙ্গে থাকতে পারে না।* আমাদের অবস্থা সে রকম, এক রুমে আমরা তিন ঘণ্টা ছিলাম। গত তিন ঘণ্টায় তাকে ইচ্ছামতো আদর করি। জানি না, আমার মতো অন্য কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে এতোটা...! করতে পারে কি না।

শুধু আদর নয়, সেই দিন আমার ভালোবাসার মেয়েকে এমন একটা জিনিস দিয়েছি যা বলে বা লিখে বোঝাতে পারবো না। সেদিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমার আশা এবার ভালোবাসা দিবসে তাকে একশটা চুমু দেবো এবং সেই ২২ মার্চ–এর ঘটনাটা আবার ঘটাবো।

সবচেয়ে মজার ঘটনা হলো এর আগে কোনোদিনও কোনো মেয়ের বুকে হাত দিইনি। সেদিন ছিল আমার প্রথম একটা মেয়ের বুক হাত দেয়া। তার বুকে হাত দিয়ে খুব আনন্দ বোধ করলাম। সে যদিও প্রথমে বিরক্ত বোধ করেছিল তবুও পরে আর বাধা দেয়নি। কিছু সময় পার না হতেই সে আর ঠিক থাকতে পারলো না। তার মনের চাওয়া এবং ইচ্ছায় দুজন হারিয়ে গেলাম নীল ছবির জগতে! সে কি মজা!

এভাবে কেটে গেল ২২ মার্চ–এর তিন ঘণ্টা, জানি না আর সে সুযোগ আমাদের হয় কি না। তবে আমার ইচ্ছা, এবার ভালোবাসা দিবসে তাকে খুব কাছে পাই। যদি তার সঙ্গে আমার ভালোবাসা দিবসে দেখা না হয় তাহলে দূর থেকে তাকে একটা উড়ন্ত চুমু দেবো, সে যেন ভালোবাসা দিবসে তিনটা এক মিনিটে বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করে।

ভালোবাসা দিবসে তোমাকে কাছে না পেলে তুমি ভেবো না, আমি ভুলে গেছি। তুমি আমারই আছো এবং থাকবে।

ঢাকা থেকে

প্রেম এবং ঘর

– সজীব আহমেদ আল শহীদ

আমরা দুজনে দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। সে আমাকে, আমি তাকে। কথাটা আপাতত এভাবেই সত্য। কিন্তু আবেগ–ভালোবাসা স্থিত নয়, আপেক্ষিক। আমরা একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। অবাধে মিশেছি। হেসে–খেলে, মান–অভিমান করে সুখের আঙিনায় একটি ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেছি। শঙ্খনীল জ্যোৎস্নায় দুজনে হারিয়ে গেছি সৃষ্টির উন্মাদনায়।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তার এক আত্মীয়র বিয়েতে। তার নাম বীনা। সদ্য এসএসসি পাস করা টগবগে এক তরুণী। চেহারায় কি এক জাদু আছে, দেখলেই ভালো লাগে। প্রথম দেখাতেই তাকে ভালোবেসে ফেলি। তার কাছে আসার চেষ্টা করি। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো সব কিছুই আমার ছিল। নিজের প্রতি আমার আস্থা খুব বেশি।

মেয়েটি এক সময় তার দুর্বলতা প্রকাশ করলো। বুঝতে পারলাম তাকে সম্মোহিত করতে পেরেছি। সব জড়তা কাটিয়ে বিয়েবাড়ির একটি নির্জন ঘরে কঠিন আবেগে তাকে চুমু দিই। তার মুখখানা লাল হয়ে যায়। ললাট ও নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে। ঠোঁট দুজনের একাকার। আমার দুষ্ট চঞ্চল হাত ছুয়ে যায় তার অহংকারের হিমালয় চূড়া। এক সময় শরীরের তাপমাত্রা ভাগাভাগি করে নিতে আপত্তি থাকে না। ভালোই কাটে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান।

দুদিন পর সে চলে যায় বাড়িতে। আমার দিনগুলো খুব কষ্টে কাটছিল তাকে ভেবে ভেবে। একদিন তার একখানা পত্র পেলাম। সে লিখেছে –

সজীব,

ভালোবাসা নিও। তুমি আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছো তা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তোমার ব্যক্তিত্ব, সরলতা, সৌন্দর্য বোধ এবং নিজেকে উপস্থাপন করার কৌশল সবই আমার ভালো লেগেছে। তোমার মধ্যে যে কি সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা তুমি জানো না। তোমার সব কিছুতেই আমি মুগ্ধ। তোমার কোনো কিছুই আমার দেখা বা জানার দরকার নেই। একটি মেয়ে তার প্রাণপুরুষের কাছে যা আশা করে তা তোমার আছে। তোমার জীবনটাকে আমি আরো সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে প্রচুর ভালোবাসো এবং তোমার ভালোবাসা থেকে কোনোদিনই বঞ্চিত করবে না। তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমার জীবন মূল্যহীন।

তার চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম – আমার সুখ, দুঃখ, অসচ্ছলতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব কিছু মিলিয়ে তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা বাস্তবে রূপ দেয়ার জটিলতার কথা।

আমাদের মধ্যে দেখা–সাক্ষাৎ এবং পত্র বিনিময় হতে লাগলো। একজনে আরেকজনকে না দেখে, কথা না বলে থাকতে পারি না। আমার বন্ধুর বাসায় অনেক দিন নির্জন সময় কাটিয়েছি। যুগল ছবি তুলেছি। সবাই আমাদের সহজভাবে মেনে নিতো। তার ক্লাসমেট এবং বান্ধবীরা সবাই আমাকে চিনতো।

এরই মধ্যে তার আত্মীয়স্বজন সবাই আমার কথা জানলো। একদিন তার বোনের বাসায় দুলাভাই এবং বোনের সঙ্গে আমার কথা হলো।

আমার সব কিছু জেনে তারা আমাকে পছন্দ করলেন না। প্রধান সমস্যা বেকারত্ব এবং আর্থিক অসচ্ছলতা। তারা তাকে আমার সঙ্গে মিশতে এবং কোনো সম্পর্ক না রাখার জন্য মানসিক চাপ প্রয়োগ করলো।

সে তাদের চাপে নত হলো। কিন্তু আমাকে কিছুই বুঝতে দিল না।

মেয়েরা বাস্তববাদী হয়। স্বপ্ন, আবেগ দিয়ে ভালোবাসা হলেও জীবন চলে না। এটা সে বোঝে। তাকে একটি সচ্ছল সংসারের নিশ্চয়তা দিতে পারিনি বলে সে আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলো না।

পরে একদিন কলেজে দেখা করতে গেলে দেখা করলো না। তারপরও তাকে চিঠি লিখে আমার কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

কিছুদিন পরে তার একটি পত্র পেলাম। আমাকে আপনি সম্বোধন করে লিখেছে –

মি. সজীব,

কি যোগ্যতা আছে আপনার আমাকে বিয়ে করার? আপনাকে আমি কখনো ভালোবাসিনি, অভিনয় করেছি মাত্র। যদি ভালো চান তাহলে আমার সঙ্গে দেখা বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না। যদি করেন তাহলে আপনাকে চরম অপমান করবো।

আমার হৃদয়ে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটলো। আমার কোনো যোগ্যতাই সেদিন দেখাতে পারিনি। যোগ্যতার মাপকাঠি যেখানে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ সেখানে আমার কিছুই নেই।

কাজের সন্ধানে ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাকে ছেড়ে দূরে যেতে ইচ্ছা করছিল না। যাবার সময় আবারও কলেজে দেখা করার চেষ্টা করলাম।

তার সিদ্ধান্তে সে অটল।

ভাঙাগড়ার খেলায় আমি হেরে গেলাম। ঢাকায় একটি চাকরির ব্যবস্থা হলো। কয়েক মাস করার পর বুঝলাম এভাবে আমার চলবে না। বেতন যা পাই থাকা-খাওয়া এবং খরচের হাতটা একটু প্রশস্ত হওয়ার কারণে মাসের শেষে কিছুই জমে না। তাছাড়া কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। তার স্মৃতি ভুলে যাওয়া সম্ভব হলো না।

এলাকায় ফিরে এসে ব্যবসা শুরু করলাম। ব্যবসা কোনো রকমে চললো। বাড়ি থেকে অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম। তাই থাকা-খাওয়ার বিশেষ অসুবিধায় ছিলাম।

বন্ধুরা আমাকে বিয়ের পরামর্শ দিল। মেয়ে দেখা হলো। বিয়ে করে ফেললাম। বিয়ের পিড়িতে বসে, বাসর ঘরে ঢুকে যার মুখখানা বার বার ভেসে উঠছিল সে আমার পুরনো ভালোবাসা, পুরনো স্মৃতি। আমার প্রেম যাকে সযত্নে পুষে রেখেছি হৃদয়ের গভীরে।

আমার স্ত্রী সহজ-সরল, ধর্ম ভীরু এক নারী। সে আমাকে ভালোবাসে, ভক্তি করে। তার আদর্শ ত্যাগ সবই আমাকে বিমোহিত করে। বিয়ে করার পর আমার নিজের বাড়ি হলো। সচ্ছলতার জন্য ভালোভাবে বেচে থাকার জন্য যা যা দরকার সবই আমাদের আছে। আমরা সুখী দম্পতি।

নিজেকে তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলাম। মনিরাও আমার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। মনিরা জানে, আমি বীনা নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। আমি কোনো কিছুই গোপন করিনি। বীনার লেখা ৯১টি চিঠি মনিরা যত্ন করে রেখেছে স্বামীর সম্পদ হিসেবে।

বিয়ের ছয় মাস একদিন পর বীনা তার এক ক্লাসমেট-এর মাধ্যমে আমাকে দেখা করার অনুরোধ জানালো।

আমার মনের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। ভালোবাসা কখনো মরে না। আমার হৃদয়ে সুপ্ত ভালোবাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এক দুপুরে রাজেন্দ্র ইউনিভার্সিটি কলেজ ক্যাম্পাসে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু প্রথম দিন আমরা ফ্ হতে পারলাম না। জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ইত্যাদি কথাবার্তা চললো। পরে দেখা হবে বলে সেদিন বিদায় নিলাম।

আমরা দুজনে দুজনকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। একজনকে ছাড়া আরেকজন থাকতে পারি না। সপ্তাহে দুই তিন দিন আমাদের দেখা করতে হয়, ফোন করি। তার মাঝে সুখ খুজি তন্ন তন্ন করে।

আমি সত্যি সত্যি ভুলে যাই আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছু। তখন তার সান্নিধ্যই আমার বেচে থাকার প্রেরণা যোগায়। সে তার ইচ্ছার একটি চিঠিতে জানায় –

সজীব,

তুমি আমাকে নিয়ে অনেক দূরে হারিয়ে যেতে চাইতে। কিন্তু কোনো কারণে তখন হয়নি। আমি তোমাকে নিয়ে এখন হারিয়ে যেতে চাই। জানি, তোমার পিছুটান আছে। যদি সে বন্ধন থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে পারো তাহলে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে জীবনের স্থিতি খুজে পাবো। কিন্তু তুমি যা ভীরু তাতে রিস্ক নিতে সাহস হয় না।

তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালোবাসে। বিশ্বাস করো তারচেয়ে তোমাকে আমি একটুও কম ভালোবাসবো না। তোমার জন্য সব পথই খোলা আছে। কিন্তু আমার পথ মাত্র একটা। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষের ছোয়া পেতে চাই না। আর তা সম্ভবও নয়। আমার পৃথিবীটা ছোট হতে একটা ফুটবলের সমান হয়ে গেছে। একমাত্র তুমিই পারো আমাকে নতুন একটা পৃথিবী উপহার দিতে। এখন ভেবে দেখো, তুমি কি করবে।

চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম আমার অস্তিত্ব আবারও হারিয়ে ফেলছি। হারিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে। অনেক দুপুর–বিকেল তার সঙ্গে নির্জনে কেটেছে। একাদশী চাদের জ্যোৎস্নায় তার চাদমাখা মুখখানা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছি। বুঝেছি এটা আমার পাপ। ঘরে আমার স্ত্রী থাকতে এভাবে কারো সঙ্গে মেশা উচিত নয়। কিন্তু তার কাছে এলে আমার সব অপরাধবোধ ম্লান হয়ে যায়।

মনিরাকে সে কখনো ছোট করে দেখে না। সে বলে, আসলে মনিরা তো কোনো দোষ করেনি। দোষ করেছি আমরা। ভুলের মাশুল আমাদেরই দিতে হবে। আমি চাই না কোনো তৃতীয় পক্ষ আমাদের মাঝে থাকুক। কিন্তু নিয়তিকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কোনো স্ত্রীই তার স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চায় না। মনিরাও চাইবে না। আমার কথা তাকে বুঝিয়ে বলো। পত্রে আমি তাকে খুব বড় মাপের মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলাম। তার ত্যাগকে সহজ করে দেখেছি।

আমি বুঝতে পারি সে এখন সেই ফার্স্ট ইয়ারে পড়া বালিকা বা তরুণী নয়। এই বছর অনার্স ফাইনাল দিয়েছে। একজন পরিপূর্ণ রমণী। তার ভালোবাসায় বিশ্বাস রেখে এতোদূর এগিয়েছি। তার এখন নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার বয়স হয়েছে। আমার পিছে ফেরার কোনো পথ নেই।

আমি এখন বড্ড অসহায়। একদিকে মনিরা, অন্যদিকে বীনা। মনিরা আমার সংসার সাজিয়েছে তার মতো করে। আর বীনা তার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ধন্য করেছে। ভালোবাসার কথা উঠলে, ভালোবাসার কোনো কিছু মনে পড়লে যার মুখ ভেসে ওঠে সে বীনা। আমার জীবনে কাকে বেশি প্রয়োজন?

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার অমিত রায়ের মতো আমি কি বলতে পারি না, মনিরা আমার ঘরে কলস ভর্তি জল। ইচ্ছা হলেই ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়। আর বীনা দীঘির জল তাকে সব সময় হাতের নাগালে পাওয়া যাবে না। সেই দীঘিতে ভালোবাসার সাতার কাটা যায়।

ইশান গোপালপুর, ফরিদপুর থেকে

দুঃস্বপ্ন

রহস্যময় এক মানুষকে ভালোবেসেছি। মজা করে তাকে একদিন বলেছিলাম, শোনো, তোমার নামটা আমার পছন্দ নয়, তোমার নাম দিলাম *দুঃস্বপ্ন*।

সে খুশি। নাম তার পছন্দ। আমার সব কিছুই তার পছন্দ, আমার কথা, আমার রাগ, আমার হাসি, সেন্স অফ হিউমার, আমার বুদ্ধি।

মুখে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করলেও মনে মনে সে হেসে হয়তো সেদিন বলেছিল, বোকা মেয়ে, তোর কপালে দুঃখ আছে।

কতো অসংখ্য চিঠি লিখেছি তার কাছে। আর প্রতিদিন যে কতো হাজার ই–মেইল করেছি তার হিসাব কে নেবে? সে তখন দেশের বাইরে । আমার দশটা ই–মেইলের জবাবে যদি সে দুটো শব্দও লিখে পাঠাতো তাহলে খুশিতে পাগল হয়ে যেতাম সেদিন। মন চাইতো চিৎকার করে বলি, আজকে আমার চেয়ে সুখী এই পৃথিবীতে কেউ আছে কি? না নেই। পৃথিবীর সব সুখী মানুষের আনন্দ একত্র করলেও আমার সমান হবে না। মাঝে মধ্যে সে বড় নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করতো।

দিনের পর দিন চলে যায়। একটা ই-মেইল পাই না। আমি কতো মেইল করি রাগ করে, আদর করে। ওইদিক থেকে কোনো উত্তর আসে না। এদিকে আমি এলোমেলো আকাশের কালো মেঘের দিকে চেয়ে বলি, বৃষ্টি, আমার কান্না সব শেষ, তুমি আমার কয়েক ফোটা ধার দাও। কেদে একটু হালকা হই।

তার মতো রহস্যময় মানুষ দেখিনি। ফোন করবো বললে দিন গিয়ে রাত চলে যায়। সারা রাত অপেক্ষায় থাকি, তার ফোন আর আসে না। আবার হয়তো হঠাৎ কোনোদিন ফোন করে চমকে দিল। মেইল করবো বলে অন্য সব কিছুই হয়তো করে, কেবল মেইলটাই করে না।

শেষবার তার দেশে ফেরার খবর শুনে ফোন করেছিলাম। কি ব্যাপার দুঃস্বপ্ন? দেশে আসছো, আমাকে জানালে না কেন?

দুঃস্বপ্ন অন্য প্রসঙ্গ ধরে। এ প্রশ্নের উত্তর সে দেবে না। কথা শেষ করে ফোন রাখার পাচ মিনিটের মাথায় তার ফোন। আমার গলা শুনতে আবার নাকি তার ইচ্ছে করছে।

এ ইচ্ছেটাই আবার পরবর্তী সাত দিন ধরেও তার করে না। অগত্যা আমিই আবার তার নাম্বারে ডায়াল করি। কখনো দুই মিনিট কখনো রাতের পর রাত, সারা রাত কতো কথা বলেছি তার সঙ্গে! কথার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। কখনো কথা, কখনো রাগ, কখনো হাসি আর মাঝে মধ্যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করা আদর। খুশিতে ইচ্ছে হতো মরে যাই। এই মুহূর্তের এই আনন্দের অনুভূতিটুকু নিয়েই চলে যাই পৃথিবী ছেড়ে।

শেষ যে রাতে কথা হয় সে রাতে তাকে সরাসরি বলেছিলাম আমার ভালোবাসার কথা। এবং বলেছিলাম দুঃস্বপ্ন, তোমার সঙ্গে কি আর কখনো কথা হবে?

হ্যা হবে, হবেই হবে।

তুমি দুমাস পর দেশে ফিরলে দেখা হবে?

হ্যা হবে।

আমার কথা মনে থাকবে তো দুঃস্বপ্ন?

মনে থাকবে।

সত্যি মনে থাকবে?

হ্যা মহারানী মনে থাকবে।

সত্যিই কি আশ্চর্য! মনে রেখেছো আমাকে তুমি।

শুনেছি সে দেশে ফিরেছে। ফোন করেছিলাম তার কাছে। ওপাশ থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর নিষ্ঠুর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, এই নাম্বারটি বর্তমানে খালি আছে। দয়া করে যেন অনুসন্ধানের সাহায্য নিই। আর কোথায় কোথায় তোমার সন্ধান করবো আমি?

'এ' লেভেল-এ অবিশ্বাস্য রেজাল্ট করেছি। পৃথিবীর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী যেখানে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখে তেমনই এক ইউনির্ভাসিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। সবাই বিস্মিত। আমি নির্বিকার। আমার জীবন আগের মতোই স্বপ্নহীন। বাবা মায়ের বিচ্ছেদ, ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা কোনো কিছুই আমাকে আর বিচলিত করে না।

মাঝখানে ড্রাগস ধরেছিলাম। মাস দুয়েকের মাথায় ছেড়ে দিয়েছি। ভালো লাগে না। অন্যান্য সঙ্গীরা সমীহ মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকায়। এতো সহজে ড্রাগস ছেড়ে দেয়া সম্ভব? তাদের কেমন করে বোঝাই আমার রক্তে যার নেশা, অন্য নেশা তার কাছে তুচ্ছ।

দাদু প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, এভাবেই তোর জীবন যাইবো রে বুবু?

উত্তর দিই না, মনে মনে বলি, যাচ্ছে কোথায় দাদু? জীবন তো থেমে আছে। কেউ চলে গেছে বলে সব থেমে গেছে, অথচ সে হাত বাড়ালেই বেচে উঠতে পারি। একটা মানুষের কতো ক্ষমতা!

বন্ধুরা সব দেশের বাইরে। আমারও বোধহয় সময় হয়ে এলো। ভিসার জন্য লাইনে দাড়ানো নামে বিরক্তিকর এক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কতো কাজ, কতো রকম কাগজপত্র জোগাড় করা বাকি। কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো? তার সঙ্গে দেখা না হোক, কথা না হোক, সে আর আমি একই শহরে এ অনুভূতিটা তীব্র আনন্দ দেয়।

অদ্ভুত এক জীবন কাটাচ্ছি এখন। হাসি নেই, কান্না নেই, স্বপ্ন নেই, বিস্ময় নেই। সারা দিন ঘর অন্ধকার করে বসে থাকি। শাদা কাগজে রঙিন ব্রাশ চালাই। যে রঙ, যে ছবি জীবন থেকে মুছে গেছে তা-ই কাগজে ফিরিয়ে আনার হাস্যকর চেষ্টা! মাঝে মধ্যে ঘুরতে বের হই। একা, সঙ্গীহীন, রাস্তার পর রাস্তা, অলিগলি, গন্তব্যহীন। কখনো যার সঙ্গে দেখা হবে না তাকে খুজি। যার জীবনে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই, যার স্মৃতিতে আমি নেই, যার কোথাও আমি নেই তাকে খুজি।

কোনোদিন যদি দেখা হয় তাকে বলবো, যদি ভালোবাসো আমাকে তাহলে বলো, ঘৃণা করলে তাও বলো এবং আমাকে মুক্তি দাও। তোমার দুঃসহ স্মৃতি থেকে, তোমার দুঃস্বপ্ন থেকে এবার মুক্তি দাও বন্ধু।

কে জানে? হয়তো এসব কিছুই বলা হবে না। হয়তো বলা হবে না সত্যি কথাটাও দুঃস্বপ্ন, তোমাকে আমি ভালোবাসি।

নাম ঠিকানা বিহীন

সতর্কীকরণ : ভুয়া প্রেমিকদের হইতে সাবধান

– শ্রাবন্তী

আমি যায়যায়দিন নামে পত্রিকাটির বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা পড়েছি। বেশির ভাগ লেখাই থাকে প্রেম ও ভালোবাসা ঘিরে। এ বিষয়ে যতোগুলো লেখা পড়েছি তার মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েরা প্রতারিত হয়েছে। এসব প্রেম কাহিনীর মূলে রয়েছে শারীরিক সম্পর্ক।

আজকালকার প্রেমিকরা ভালোবাসার অপর নাম দিয়েছেন *শারীরিক সম্পর্ক*। কিন্তু আমার মতে, তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। সেসব প্রেমিকাদের উদ্দেশে বলছি, যারা বর্তমানে প্রেম করছেন, আপনার প্রিয় মানুষটিকে একটিবার যাচাই করে নেবেন। আপনার মনের মানুষটি যদি আপনার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখতে চায় তাহলে বুঝে নেবেন যে, তার চরিত্রটি মোটেই ভালো নয়। একটিবার ভেবে দেখবেন, সে যদি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে তাহলে কখনোই শারীরিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেবে না। প্রতিটি মেয়েই চায় তার প্রিয় মানুষটিকে নিজের সব কিছু উৎসর্গ করতে।

প্রেমিকাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, বিয়ের আগে কখনোই এ ধরনের ভুল করবেন না। বর্তমানে বেশির ভাগ ছেলেরাই ভুয়া প্রেমিক সেজে মেয়েদের সর্বনাশ করছে। তারপরেও মানুষ প্রেম করে এবং করছে। ছেলেদের প্রতি আমার অনুরোধ, *প্রেম* শব্দটিকে এভাবে আর অপমানিত করবেন না। হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন কোনো ছেলেই বিনা উদ্দেশ্যে প্রেম করতে চাইবে না। তখন মেয়েদের প্রেমের প্রতি বিশ্বাস থাকবে না। তখন প্রেম-ভালোবাসার পরিমাণ দাড়াবে শূন্যের কোঠায়।

সকলের প্রতি আমার অনুরোধ, প্রেম করবেন ঠিকই কিন্তু কখনো আপনার প্রিয়জনকে ঠকাবেন না। কথায় আছে, *মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান কথা।* তাই এমন জঘন্য অপরাধ কেউ করবেন না। পৃথিবীর সকল প্রেমিক ও প্রেমিকাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা রইলো।

দিনাজপুর থেকে

একতরফা

ইচ্ছা থাকলেও অনেকে ভালোবাসতে পারে না। আবার ইচ্ছা না থাকলেও অনেকে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার মোহে আটকে পড়ে। কোনো ছেলেমেয়ের ভালোবাসা করার ইচ্ছা থাকে না এ কথা ভাবাই ভুল। ভালোবাসার বিষয়টা কিছুটা একে অপরের পছন্দের ওপর নির্ভর করে। আবার অনেক সময় তেমন পছন্দ না হলেও দুজনের ভালোবাসা হয়ে যায়।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ। যারা ভালোবাসার পরিবেশ পায় তাদের ভালোবাসা সহজে জমে ওঠে। আর যারা পরিবেশ পায় না তাদের জমে ওঠা তো দূরের কথা, তাদের ভালোবাসার পথে পা বাড়ানোও কষ্ট হয়ে যায়। ভালোবাসার পরিবেশ না পাওয়া অভাগাদের মধ্যে আমিও একজন।

আজ থেকে বাইশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন চব্বিশ। আমার নিজ গ্রামের একটি সুন্দরী মেয়েকে তার অজান্তে একতরফাভাবে ভালোবাসতাম। মেয়েটি সে সময় ছিল ক্লাস এইটের ছাত্রী। তার স্কুলের ঠিকানায় আমার নাম ঠিকানা উহ্য রেখে প্রথম প্রেমপত্র লিখি। তাকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রায়ই তার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখতাম।

হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, সে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আগের মতো নাম ঠিকানা উহ্য রেখেই তার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি ও আমার লেখা কবিতা পাঠানো অব্যাহত রাখলাম। আমার মতো একজন একতরফা প্রেমিক যে তার কাছে নিয়মিত প্রেমপত্র পাঠায় এটা একটু ফাস করে দেয়ার জন্য তার ছোট ভাইয়ের কাছেও চিঠি ও কবিতা পাঠিয়েছি। প্রেমপত্রে আমার নাম ঠিকানা উহ্য থাকলেও মেয়েটি যাতে সামান্য একটু চেষ্টা করে অতি সহজেই আমাকে আবিষ্কার করতে পারে সে ধরনের ইঙ্গিত প্রতিটা চিঠিতেই দেয়া থাকতো।

একের পর এক প্রেমপত্র লিখলেও দুঃখের বিষয় তার কাছ থেকে কোনোদিন কোনো প্রকার সাড়া পাইনি। তবুও তাকে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসতাম। তাকে নিয়ে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতাম। তাকে আমার কল্পনার রাজ্যের রানীর আসনে স্থান দিয়েছিলাম।

তাকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নে তাকে বিয়েও করেছি।

এরই মধ্যে একদিন শুনলাম যশোর শহরে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। এতে মনের দিক থেকে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এর কিছুদিন পর যখন জানতে পারলাম, তার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে তখন যে কষ্ট পেয়েছিলাম তা কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়।

বিবাহিত জীবনে তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক কতোটুকু মধুর হয়েছিল জানি না। তবে সে এক সন্তানের মা হওয়ার পর তার স্বামীর বড় ভাইয়ের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে স্বামীর কাছেই ধরা পড়ে যায়। এ ঘটনায় তার স্বামীর হাতেই স্বামীর বড় ভাই নির্মমভাবে খুন হন। এরপর তার স্বামী তাকে তালাক দিলে সে পিতার বাড়িতে চলে আসে এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছোটখাটো একটা চাকরি করে।

তালাক পেয়ে পিতার বাড়ি চলে আসার পর প্রথম প্রথম সে ঠোট লাল করে অত্যন্ত সেজেগুজে রাস্তায় চলাচল করতো। এটা এলাকার অধিকাংশ মানুষের নজরে পড়তো। অনেকে বিরূপ সমালোচনাও করতো। খুব সাজগোজের কারণ হিসেবে জানা যায়, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পছন্দমতো কেউ প্রস্তাব দিলে সে আবার বিয়ে করবে।

দ্বিতীয় বিয়ের আশা পূরণ না হলেও বিভিন্ন মাধ্যমে শোনা যায়, ওই সময় সে কলগার্ল হিসেবে আবাসিক হোটেলসহ বিভিন্ন বাসায় যাওয়া-আসা করতো। আরো জানা যায়, বেপরোয়া আড্ডাবাজির জন্য কে বা কারা তাকে একবার অপহরণও করেছিল।

বর্তমানে তার সাজগোজ, চলাফেরা অসহায় নারীর মতো, একেবারেই করুণ। তার চলমান অবস্থার জন্য আমার কোনো সময় করুণা হয় আবার কোনো সময় চরম ঘৃণাও হয়।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বৃত্তের বাইরে

– স্বর্ণা

অনার্সে ভর্তি হয়ে বিশাল বিদ্যাপীঠের অসংখ্য অচেনা মানুষের ভিড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিছুটা সময় কেটে গেল। সঙ্গে পেলাম খুব ভালো কয়েকজন বন্ধু–বান্ধবী। সেই সঙ্গে মনের আবেগ প্রকাশ করার মতো তাকেও পেলাম। কিন্তু অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসার চিরন্তন শব্দগুলো আজও বলা হয়নি। কারণ নিজের বিবেকের উত্তরহীন প্রশ্ন এবং সমাজের নীরব, অথচ ধারালো প্রশ্নার্ত চোখের অন্তরালে ঢাকা পড়েছে আমার আবেগ, আমার ভালোলাগা, আমার ভালোবাসা।

ক্লাসে প্রতিদিন দেখা হতো তার সঙ্গে। দুই একটা কথাও হতো। কিন্তু নবীনবরণের দিন তাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। অডিটরিয়াম ভর্তি শ্রোতার সামনে স্টেজে দাড়িয়ে সে যখন আবেগ মাখা কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছিল তখন আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুধু তাকেই দেখছিলাম। খেয়াল করছিলাম তার বাচনভঙ্গি, প্রতিটা উচ্চারণ। কি মধুর ধ্বনি! বেশ আন্দোলিত ও পুলকিত হচ্ছিলাম বার বার। সেদিন থেকেই এক অজানা ভালো লাগা ও ভালোবাসায় দুই চোখ শুধু তাকেই খুজে বেড়াতো। অবশ্য সেও ব্যাপারটা প্রায়ই খেয়াল করতো।

ক্লাস শেষে বা অফ টাইমে যখন মাঠে বসে আড্ডা দিতাম তখনো দূর থেকে শুধু তাকেই লক্ষ্য করতাম। সে ছিল বেশ সাধারণ। তবুও এমন কিছু তার মধ্যে ছিল যার জন্য তাকে অন্যদের চেয়ে সহজেই আলাদা করা যেতো। সম্ভবত সেই অজানা, অদৃশ্য শক্তিই হয়তো আমাকে তার প্রতি এতোটা আকৃষ্ট করেছিল।

দলের সবাই এ নিয়ে বেশ ফাজলামো করতো আমার সঙ্গে। কখনো বা আমাকে খুশি করার জন্য তাকে অযথাই ডেকে এনে খাজুরে আলাপ করতো বন্ধুরা। তবে বন্ধুরা ফাজলামোর পাশাপাশি সাহস ও পরামর্শ দিতো।

যাহোক, তাদের সবার পরামর্শ, অনুপ্রেরণা, প্ররোচণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠিক করলাম তাকে মনের কথাটা জানাবো।

পরদিন ক্লাস শেষে সে বাইরে বের হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। আমি দুরু দুরু পায়ে তার দিকে আগাতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো এ আমি কি করছি! কেন একটি ছেলেকে বিব্রত অবস্থায় ফেলতে যাচ্ছি? কেন একটি ছেলের জীবনকে তার পরিবারের প্রশ্নার্ত চোখের সামনে দাড় করাতে যাচ্ছি? কেন তাকে আমার মনের কথা জানাতে চাচ্ছি? এতোগুলো প্রশ্নের বেড়াজালে আটকে আস্তে আস্তে তলিয়ে গেলাম। আর এক কদমও আগাতে পারলাম না সামনের দিকে। ভালোবাসার বৃত্তের অনেকটা বাইরেই রয়ে গেলাম নীরবে, নিভৃতে।

মাত্র ছয় মাস বয়সে আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। সাত দিন টানা জ্বর ছিল। কিন্তু তার অস্তিত্ব রেখে যায় আমার পায়ে। পোলিওতে আমার এক পা অন্য পায়ের তুলনায় কমজোর হয়ে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক পা বেশ চিকন ও ইঞ্চি পরিমাণ ছোট হয়ে গেছে। হাটলে সেদিকে খানিকটা ঝুল পড়ে। প্রতিটি ছেলেই চায় তার প্রেমিকা বা সঙ্গিনী হবে আপাতদৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ যাতে দুজনে পাশাপাশি হাটলে কেউ যেন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে না দেখে। কোনো প্রশ্নার্ত আঙুল যেন না ওঠে অর্থাৎ সকলের চাওয়া অল পারফেক্ট। কিন্তু আমি তো...।

রাজশাহী কলেজ থেকে

রক্ষণশীল

যে কাহিনী লিখলে কয়েক খণ্ড উপন্যাস হয়ে যায় তা এক হাজার শব্দে সংকোচন করা কঠিন। ১৯৮৬ সালের গোড়ার দিকের কথা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বরিশাল শহরে ছোট খালার বাসায় উঠলাম। সরকারি বিএম কলেজে পড়বো আর খালার বাচ্চা দুটির পড়ালেখা দেখাশোনা করবো। এ জন্যই খালা তার বাসায় উঠতে বললেন।

এই খালার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল অতি সুন্দর। শ্রদ্ধা করতাম মায়ের মতো, ভালোবাসতাম নিজেকে মা-কে যেমন বাসে। তার কোনো কষ্টে আমিও কষ্ট পেতাম। বলা দরকার যে, আমার নানা, মামা এবং এই খালার বাসা একই সড়কে পাশাপাশি। আমার তিন মামার দুজনই বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন এবং বড় মামা প্রকৌশলী। তিনি দেশে থাকেন। আত্মীয়-স্বজন, ভাগ্নে-ভাগ্নি, বোনদের এড়িয়ে চলেন। এই তার স্বভাব। তার দুই মেয়ে, এক ছেলে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলাম। জানতে পারলাম মামার বড় মেয়েটা পাস করতে পারেনি। বিএম কলেজের ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল ফরমালিটিজ শেষ করে ক্লাসও শুরু করে দিলাম। কি উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কলেজে আসা-যাওয়া তা বলার নয়। এরই মাঝে আমার এই ঘরকুনো মামা আমাকে ডেকে বললেন, আমি যদি তার মেয়েটাকে অংক ও ইংরেজি একটু দেখিয়ে দিই তাহলে সে আগামী বছর আবার পরীক্ষা দেবে।

মামার মেয়ের নামটা এখানে ব্যবহার করা যাবে না। কোনো লেখালেখিতে তার নাম ব্যবহার করবো না এই প্রতিশ্রুতি লিখিতোভাবে দিয়ে আমার বড় মামাকে ছোট বোনের বিয়েতে হাজির করতে হয়েছিল।

তাকে পড়ানোর প্রস্তাবে আমি হতবাক। তা কি করে হয়? আমাদের তো দেখা দেয়া নাজায়েজ। কঠিন পর্দা প্রথার মধ্যে আমরা মানুষ। দশ বছর বয়স থেকে নানাবাড়ির ভেতর প্রবেশ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, এখনো আছে। আমরা মামাতো, খালাতো বোনদের দেখতে পারি না। মামিদের সঙ্গেও দেখা দেয়া নাজায়েজ। তাদের সঙ্গে দেখা করা কবিরা গোনাহ।

আমি তাকে পড়ানো শুরু করলাম। একটি বড় পর্দা। তার এক পাশে আমি, অন্য পাশে সে এবং তার ছোট বোন সার্বক্ষণিক পাহারাদারের দায়িত্বে। তিন দিন পড়ালাম তাকে। কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে পর্দাটা সরে গিয়েছিল। আমি তাকে দেখলাম কয়েকবার। চতুর্থ দিন আমার নানু ঢাকা থেকে ফিরে এসেছেন। খালাদের কাছে সব শুনলাম। তিনি বললেন, এই বাড়িতে আল্লাহর গজব নামবে। পুরো মহল যেন বিক্ষুব্ধ।

তাদের বাসায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আমার। এরপরেও সে মাঝে মধ্যে তার ছোট ভাইকে দিয়ে অংক বই পাঠালে কিছু অংক কষে আবার পাঠিয়ে দিতাম। একদিন অংক বইয়ের মাঝে একটি চিঠি আবিষ্কার করলাম। এ চিঠিই আমাকে অন্য পৃথিবীতে নিয়ে গেল। আমিও লিখতে বসলাম। বাংলা অভিধান খুজে খুজে ভালোবাসার শব্দ দিয়ে চিঠি সমৃদ্ধ করি। আবার তা তার বইয়ে করে পাঠাই। কতো সুন্দর দিনই না আমাদের ছিল যেন হাজার বছরের প্রেমে আটকা পড়ে গেলাম। একদিন চিঠি না পেলে সে কি অস্থিরতা!

পড়াশোনার নাম করে সে গভীর রাতে জানালার পাশে বসে থাকতো, আমি এসে উকি মেরে কথা বলতাম। এভাবে এক মাস অতিক্রম হলো। এক রাতে সে চলে এলো আমার কাছে। আমি যে রুমটাতে থাকতাম তার পাশের রুমেই খালা-খালু থাকেন। সে রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। সে এসে দরজার কড়া নাড়াচ্ছে আর আমার নাম ধরে ডাকছে। আমার ঘুম ভাঙার আগেই খালা-খালুর ঘুম ভেঙে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল। আমি তন্দ্রার মধ্যে শুধু এটুকুই টের পেলাম।

সুখের দিন স্থায়ী হয় না। শুরু হলো তাণ্ডব। এমন পাপ যেন পৃথিবীতে আর হয়নি। প্রেম করার মতো জঘন্য পাপ এ বাড়িতে হয়েছে। আমাকে ধিক্কার করে দিতে থাকলো সকলে মিলে। আল্লাহর গজবের ভয় দেখানো হচ্ছে। এর মাঝেও আমি শুধু তার কথাই ভেবে চলেছি। তার ওপর না যেন কোন স্টিমরোলার চলছে।

তার চাচাতো ভাইয়েরা বলেছে, এতো সাহস আমার কি করে হলো, তার চাচাতো বোনের সঙ্গে প্রেম করে? ইত্যাদি। অথচ তারাই আজকাল পতিতার সঙ্গে শোয়, গৃহপরিচারিকার সম্ভ্রম হানি করে জরিমানা দেয়।

সে বন্দীশালায় আটক। কথা বলা কিংবা দেখা করার কোনো উপায় নাই। কলেজে যাই না। এখানে-ওখানে ঘুরে দিন কাটাই। একদিন রাতে ফিরে এসে জানতে পারলাম, আমার ব্যাগের তালা ভেঙে আমার নানু ও খালা তার লেখা চিঠিগুলো বের করে তার বাবার হাতে দিয়েছে। সে যে আমার কাছে এসেছিল, প্রেম করার মতো জঘন্য পাপ যে করে ফেলেছে তা তো প্রমাণ করতে হবে! এরপরে সেও আমার লেখা চিঠিগুলো বের করে দিয়েছে। যেন ইস্রাফিল সিংগায় ফুক দিয়েছেন। আমি ছটফট করতে থাকলাম। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কি করে তাকে জানাই তার চিঠি আমি বের করে দিইনি। কারণ তুমি আমার কাছে অনেক বড়।

আমার বাবা-মাকে ডাকা হলো। তারা এলেন, নানু, খালার পারিবারিক আদালতের রায়ে আমাকে শহর ছেড়ে দিতে হলো। আমি গ্রামে ফিরে গেলাম।

গ্রাম থেকে প্রতিদিন শহরে আসি কলেজের উদ্দেশ্যে। একটি ক্লাসও করা হয় না। তাদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করি। পরিচিত-অপরিচিত লোকজন ভ্রূ কুচকে তাকায়। এভাবে প্রায় দুই বছর কেটে গেল। একবারও তার দেখা মেলেনি।

কলেজ পার হয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তি হলাম। গ্রাম থেকে সরাসরি ঢাকায়। বিএম কলেজের একশ পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কাউকে পেলাম না এখানে। বড় একা। কারো সঙ্গে মিশতে পারি না। যারা ঢাকা কলেজ কিংবা নটর ডেম থেকে এসেছে তাদের নিজস্ব গ্রুপ আছে। আমার তো কিছু নেই। লোক প্রশাসনের থিওরি, অ্যাসাইনমেন্টের চাপ, ইনকোর্স পরীক্ষা, আবাসিক হলে সিটের হাহাকার। মোটকথা, টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত।

হলে আমার জায়গা হলো না ফার্স্ট ও সেকেন্ড ইয়ারে। চলে গেলাম রামপুরার একটি মেসে।

একদিন হঠাৎ আমার বাবা এখানে এসে হাজির। বললেন, বরিশাল যেতে হবে।

চললাম তার সঙ্গে। গিয়ে জানলাম ছোট খালার বাসায় কে বা কারা বড় অংকের টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। জীবনের হুমকি দেয়া হয়েছে। এই চিঠিতে আমার নাম জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। পরিবারের সকল লোক ছোট খালার পক্ষে। আর আমি একা।

চিঠির ব্যাখ্যা ছোট খালা এভাবে করলেন – এ কাজ আমার, তিনি দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ (আমাকে) পুষেছেন। তার সঙ্গে প্রেম করতে দেয়া হয়নি বলে এভাবে আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি। তাকে বোঝাতে পারিনি, যে কোনো সন্তান তার মায়ের প্রতি এ অন্যায় করতে পারে না।

এদিকে তার চাচাতো ভাইয়েরা ঢাকা থেকে বরিশাল ছুটে এসেছে। আমার বিরুদ্ধে থানায় কেস করার জন্য যাবতীয় উপদেশ খালাকে দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমার পড়ালেখা বন্ধ করে দেয়া। বিধাতা তোমাকে প্রণাম। তুমি তা হতে দাওনি।

আমি জানি, এ অপবাদও তার কানে গিয়েছে, বিশ্বাসও করেছে। ঘৃণা জন্মেছে আমার ওপর। তারই বা কি করার আছে? সে যে একপক্ষের কথাই শুনে আসছে।

একদিন কানে এলো তাকে তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তো আমার আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না। এখন প্রলয় ঘটলেই বা কি! শুনলাম তার ডিভোর্স হয়েছে। কিছুদিন পরে আবার বিয়ে হয়েছে। সব শুধু অন্যের মুখে শুনি। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কেন এতো টানা হেচড়া তাকে নিয়ে?

এ সকল ঘটনার বয়স আজ সতেরো বছর। পানি অনেক গড়িয়েছে। কিন্তু স্মৃতি? সে তো পাথর। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে থাইল্যান্ড-এর এশিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি থেকে ডিগ্রি নিলাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করছি। বর্তমানে দেশের বাইরে পিএইচডি-তে গবেষণারত আছি। অনেক বন্ধু-বান্ধব বলে, তুই খুব ভাগ্যবান, খুব সুখী মানুষ!

কি জানি তারা ঠিক বলে কি না।

সে হয়তো এতোদিনে ভুলে গেছে আমাকে। সব কিছু। হয়তো তার কোনো কষ্টই নেই। এমন কাপুরুষের জন্য কারই বা কষ্ট হয়? আমারও কোনো কষ্ট থাকবে না যদি একবার তাকে বলতে পারতাম, আমি কাপুরুষ নই, আমি তোমার চিঠিগুলো বের করে দিইনি। সত্যিই আমি তোমাকে চেয়েছিলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিংগাপুর থেকে

অতুলনীয়

– বুলবুল আহমেদ

নীল শাড়িতে ছিপছিপে লম্বা নীলাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ের রঙ ফর্শা না হলেও এমন মায়াবী চেহারার মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। নীলার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অথৈ সাগরের মাঝে দিশেহারা নাবিকের মতো মনে হয়।

সিমেন্ট ক্রসিং থেকে রিকশা নিয়ে দুজনে উঠে পড়লাম। বললাম, কোথায় যাওয়া যায়?

যেখানে খুশি নিয়ে যাও, কিন্তু তোমার সময় দুইটা পর্যন্ত, এখন বাজে দশটা।

চমকে উঠলাম। কি বলছো? আজ তো সারা দিন আমার সঙ্গে থাকবে বলেছিলে।

নীলা কোমল স্বরে বললো, রাগ করছো কেন। আজ একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটা সবাই এক সঙ্গে কাটাতে চাই।

কিছু বুঝতে পারছি না।

তোমাকে বুঝতে হবে না।

বে-শপিংয়ের সামনে আসতেই রিকশাচালককে নীলা থামতে বললো। রিকশা থামতেই নেমে আমাকেও নামতে বললো।

চলো।

কোথায়?

সত্যিই বিরক্ত হচ্ছিলাম। তবু তার পিছু পিছু গেলাম। রাস্তার পাশে বসে থাকা একটি ভিখারি মেয়ের সামনে গিয়ে নীলা বসলো।

আমি পেছনেই দাড়িয়ে রইলাম।

মেয়েটিকে নীলা জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো।

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। কিছু বললো না।

তোমার নাম কি?

জেসমিন। বলে মেয়েটি মুচকি হাসলো।

খুব সুন্দর নাম।

নীলা মেয়েটির হাতে একটি একশ টাকার নোট গুজে দিল। বললো, আমাদের জন্য দোয়া করবে, কেমন?

মেয়েটি নোটটি নিল। কিছু বললো না।

দুজনে ফিরে এসে আবার রিকশায় উঠলাম। রিকশা চলতে থাকলে নীলাকে বললাম, চলো কোনো চায়নিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি।

না, আজ কোথাও বসবো না। তুমি গিয়ে দুটি কাপ আইসক্রিম নিয়ে এসো। এর বেশি কিছু না। আমি চাই আজ এই বিশেষ দিন চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খরচের টাকা তুমি কোনো গরিব-দুঃখীকে দান করবে। আমাকে তুমি প্রতিদিনই খাওয়াতে পারবে, বছরে শুধু একদিন না হয় এদের পাশে দাড়ালে।

কিছু বললাম না। মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আইসক্রিম কিনে এনে আবার রিকশায় উঠলাম। দুজনে অনেকক্ষণ রিকশায় ঘুরলাম, অনেক গল্প করলাম।

কখন দুইটা বেজে গেল টের পেলাম। শেষে সে বললো, আমার সময় ফুরিয়ে এলো। রিকশাচালককে উল্টো ঘোরাতে বলো।

আরো কিছুক্ষণ থাকো না?

না। আজ একদম সময় দিতে পারবো না। আজ অনেক দিন পর বাসায় সবাই এক সঙ্গে লাঞ্চ করবো। বাবা আজ অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন। ভাইয়া তো আজ হস্টেল থেকে বাসায় চলে এসেছেন এবং বিকেলে সবাই সি বিচ-এ বেড়াতে যাবো। খুব মজা হবে। তুমিও আসো না তোমার ছোট বোনকে নিয়ে। বলে আমার দিকে তাকালো।

কিছু বললাম না। চুপ করে রইলাম।

রিকশাচালককে থামতে বলে রাস্তার পাশে একটি ফুলের দোকান থেকে চোদ্দটি লাল গোলাপ কিনে নীলাকে দিলাম।

নীলা অবাক হয়ে চোদ্দটি লাল গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললো, এতো গোলাপ!

আজ ১৪ তারিখের চোদ্দটি গোলাপ।

নীলা গোলাপগুলো দুই হাত বাড়িয়ে নিল।

বললাম, রিকশায় উঠবো না। এখান থেকেই বিদায় নেবো।

নীলা মুচকি হেসে উঠতে বললো।

রিকশায় উঠে দুষ্টুমি করে বললাম, আজ তুমি কি আমাকে কিছুই দেবে না স্মরণীয় করে রাখার মতো?

নীলা হেসে বললো, না। তারপর আমার বাম হাত ধরে বললো, আমার হাতটা তুমি শক্ত করে ধরে রাখো, আমি এখন তোমার কাধে মাথা রেখে ঘুমাবো। বলে আমার কাধে মাথা রাখলো।

নীলার হাতটা শক্ত করে ধরলাম। এই প্রথম আমি তার দেহের উষ্ণতা অনুভব করলাম। মনে মনে বললাম, আর কিছুই চাই না।

সিমেন্ট ক্রসিং আসতেই নেমে পড়লাম। হুড তোলা রিকশাটি নীলাকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

নীলা একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

তাকিয়ে রইলাম যতোক্ষণ না রিকশাটি অন্যান্য রিকশার মাঝে হারিয়ে গেল। মনে মনে বললাম, নীলা, তোমার তুলনা শুধু তুমি।

চট্টগ্রাম থেকে

m_bulbul2003@yahoo.com

স্নেহের বন্ধন

– মাসুদুর রহমান রানা

চাকরির সুবাদে বেশ অনেক জেলায় যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তবে একটা জেলার কথা আজো ভুলতে পারিনি। জেলাটি কুষ্টিয়া।

ঢাকা থেকে সবেমাত্র বদলি হয়ে কুষ্টিয়া গিয়েছি। রাজবাড়ী থেকে মেল ট্রেনে কোর্ট কুষ্টিয়া নামলাম। তারপর ভাবলাম আজ জগতি গিয়ে আমার বন্ধুর বাসায় থাকি, কাল কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবো। বলা প্রয়োজন, আমি ও এই বন্ধু একই সঙ্গে ঢাকায় তেজগাঁও কলেজে পড়তাম।

ট্রেন থেকে নেমে একটা রিকশার কাছে গেলাম। রিকশাচালকের বয়স পঞ্চাশের উর্ধে হবে। ভাবলাম, মুরুব্বি মানুষের রিকশায় যাওয়া উচিত হবে না।

এই ভেবে যেমনি পাশে দাড়ানো রিকশার কাছে যাচ্ছিলাম অমনি বৃদ্ধ রিকশাচালক আমার হাত টেনে ধরে বললো, এই যে বাবা, আমি কি দোষ করলাম যে, আমার রিকশায় যাবে না?

বললাম, দেখুন, আপনি একজন মুরুব্বি এবং যথেষ্ট বৃদ্ধ, আমি আপনার রিকশায় উঠে অন্যায় করতে চাই না।

সে আমাকে বললো, জানেন বাবা, আমাকে সবাই আপনার মতো অবহেলা করে। কেউ আমার রিকশায় উঠতে চায় না।

বললাম, বাবা, এটা অবহেলা নয়।

যদি এভাবে আমার রিকশায় কেউ না ওঠে তবে তো না খেয়ে মারা যাবো।

বাধ্য হয়ে রিকশায় উঠে বললাম, ঠিক আছে, চলুন।

কি কারণে যেন তাকে দেখে আমার যথেষ্ট মায়া লেগে গেল। বললাম, বাড়ি কোথায়?

জগতি।

ছেলেমেয়ে কতোজন?

দুই ছেলে, এক মেয়ে।

এ কথা বলতে বলতে লোকটি হাপিয়ে উঠলেন।

রিকশা রাস্তার একপাশে রাখুন। তারপর তাকে বললাম, আপনার ছেলেরা কি করেন?

তিনি বললেন, দুজনই বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেছে।

কেন, আপনাকে সাহায্য করে না।

বললেন, বাসায়ই আসে না, আর সাহায্য! দুএক বছর পর পর এসে চার পাচ দিন থেকে চলে যায়।

টাকা–পয়সা পাঠায় না?

তা হলে কি আমার এ বয়সে রিকশা চালানো লাগে?

তার কথা শুনে এবং চেহারা দেখে অল্পতেই তার ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। কথার এক পর্যায়ে আবার রিকশা চলতে শুরু করলো। বললাম, আপনার বাসায় যদি যেতে চাই তবে নেবেন?

কি বলেন বাবা, কেন নেবো না।

বললাম, চলুন তাহলে আপনার বাসায়ই যাই।

বাসায় গেলাম। রেল লাইন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে। ঘরের বেড়া মাটির তৈরি এবং চালে আখের পাতা। জোর করে ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখি ছোট্ট একটা মেয়ে।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন, আমার মেয়ে। ক্লাস ফাইভে পড়তো। এখন অভাবের জন্য পড়ালেখা বন্ধ রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি মেয়েটির মা অনেকগুলো পাতা নিয়ে এলেন রান্না করার জন্য। তারপর জোর করে চা-বিস্কিট খাওয়ালেন। খেয়ে চলে এলাম এবং বললাম, এই নিন ঠিকানা, যখন মন চাইবে চলে আসবেন। আমি এই ব্যাংকে চাকরি করি। তাছাড়া এখন থেকে আপনি মনে করবেন, আমি আপনার ছেলে।

তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। তার স্ত্রী, মেয়ে কেউ কান্না ধরে রাখতে পারলেন না। মহিলা বললেন, বাবা, নিজের ছেলে খোজখবর নেয় না। আর তুমি...।

তাতে কি হয়েছে? এই বলে পাচশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললাম, যেদিন শরীর খারাপ হবে সেদিন রিকশা চালাবেন না।

নিতে চাইলেন না। তবুও জোর করে দিয়ে চলে এলাম।

আসার সময় সে বললেন, চলো বাবা, তোমাকে রিকশা দিয়ে পৌছে দিই।

আজ থেকে আপনি আমার বাবা। বাবার রিকশায় ছেলে যেতে পারে না। আমি না হয় অন্য রিকশা করে চলে যাবো।

রেললাইনের পাশ দিয়ে হেটে আসছি আর দেখি তারা আমার দিকে তাকিয়েই আছেন। এরপর প্রায় দুবছর তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সত্যিই তাকে পিতার মতোই ভালোবেসেছিলাম। বদলি হয়ে চাকরিক্ষেত্র পরিবর্তন করে মাদারীপুর চলে গেলাম। তারপর সাত মাস পর গেলাম তাকে খুজতে। শুনলাম, রেলের জায়গা হওয়ায় ওই এলাকা ছেড়ে সবাই চলে গেছে।

ইসলামপুর, ঢাকা থেকে

আশাহত

– সুরুজ আহমেদ

নারীসঙ্গ বঞ্চিত জীবন অসহ্য মনে হচ্ছিল। বন্ধুদের আড্ডায় জানলাম, শহরের হোটেলগুলোতে পতিতা পাওয়া যায়। সিদ্ধান্ত নিলাম, দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাবো। এক রাতে দুরু দুরু বুকে একটি হোটেলে রুম ভাড়া নিলাম।

রুম পরিষ্কার করে যাওয়ার সময় বয় জানতে চাইলো আমার কিছু লাগবে কি না।

লাগবে না মানে? আমি তো কিছু পাওয়ার আশাতেই ঘর ছেড়ে আজ হোটেলে উঠেছি। মনে মনে বললাম। মুখে বললাম, ঠিক আছে পরে জানাবো।

বেশ কিছুক্ষণ পায়চারী করলাম রুমের ভেতর। প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে। অনেকক্ষণ পর স্থির হলাম। বেল বাজিয়ে বয়কে ডেকে আনলাম। খুব সংকোচে তাকে আমার ইচ্ছার কথা বললাম। তার জবাব শুনে প্রচণ্ড হতাশ হলাম।

সে যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে, পুলিশি অভিযান বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়েকদিন শহরের হোটেলগুলোতে দেহ ব্যবসা বন্ধ রয়েছে।

বয় বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু আমার শরীরে যে আগুন জ্বলছে তা নেভাই কিভাবে?

ঠিকানা বিহীন

শপথ

– এজাজ আহমেদ

আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগের ঘটনা। আমি তখন ক্লাস নাইন কিংবা টেন–এর ছাত্র ছিলাম। ঘটনাটি আজও আমার হৃদয় গহীনে ভয়াবহ স্মৃতি রূপে জেগে ওঠে এবং আমাকে শপথ করতে উদগ্রীব করে।

সেদিন বড়আপু বাসায় এলেন। আসার পথে রিকশায় একা ছিলেন বলে খুব অস্বস্তি লাগছিল তার। দোয়া–দরুদ পড়তে পড়তে স্বামীর বাসা থেকে বাবার বাসায় এসে অনেক দিনের হাহাকার যেন নিঃশ্বাসে দূর করলেন।

মা–বাবা, আমি এবং ভাইয়া বড়আপুকে দেখতে পেয়ে প্রকাশহীন আনন্দ পেলাম। আপু দেড় বছর পর আমাদের বাসায় এলেন। প্রতিবেশীরাও বড়আপুকে দেখার জন্য বাসায় ভিড় করলেন। পরিস্থিতি তখন এতোটাই ফূর্তিময় যে, মনে হয়েছে প্রবাস থেকে বহুদিন পর বাসার আদরের সন্তান দেশে ভিজিট করতে এসেছে।

কথাবার্তা শেষ করে আপু তার ব্যাগ খুললেন। দুটি নেভি ব্লু প্যান্ট–এর কাপড় আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তোর জন্য।

কাপড় দুটি হাতে নিয়ে আনন্দে আমার চোখ জলসিক্ত হয়।

আপু মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, তোর স্কুলের প্যান্টের কাহিল অবস্থা সেদিন দেখলাম। তুই তখন স্কুল গেটে ঢুকছিলাম আর আমি চলন্ত রিকশায় ছিলাম তোর দুলাভাই–এর সঙ্গে।

এরই মধ্যে আব্বু এসে বললেন, এজাজ, বাজারে যাও, তোমার পছন্দমতো মাছ, তরকারি ও মাংস নিয়ে এসো। কয়েকজন প্রতিবেশীকেও আজ নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাই ভালোভাবে দেখে জিনিস কিনবে।

আব্বু পাচশ টাকা আমার হাতে দিলেন।

আব্বু অন্য রুমে যাওয়ার পর বড়আপুও পাচশ টাকা ব্যাগ থেকে বের করেন। আমাকে দিতেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, তুমি টাকা দিচ্ছ কেন?

আপু দরদপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, আব্বুর আর্থিক সঙ্গতি তেমন ভালো না। তবুও পাচশ টাকা দিলেন। কিন্তু পাচশ টাকায় ভালো মাছ–মাংস–তরকারি বেশি আনতে পারবি না। তাই আমিও দিলাম। এবং আমি যে টাকা দিয়েছি তা আব্বুকে জানাবি না। জানালে মনঃকষ্ট পাবেন তিনি।

বাজারে রওনা দেয়ার আগে আপুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর ভাবি, আপু দেড় বছর পর আমাদের বাসায় এলেন। দুলাভাই এর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কিছু বিরোধ ও মনমালিন্যতার জন্য তার আসার পথ কঠিন হয়েছিল। সব কিছু স্বাভাবিক হওয়ার পর আপুর আগমন সত্যিই পুলকময়।

বাজারে রওনা দিলাম আপুর পা ছুয়ে সালাম করার পর। নিউ মার্কেট কাচাবাজারে প্রবেশ করে ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা সাড়ে এগারোটা। ঘুরে ঘুরে ইলিশ, পাবদা ও শিং মাছ কিনলাম। মুরগি নিলাম তিনটি। গরুর মাংসের লাইনে গিয়ে তিন কেজি মাংস নিলাম। হাতে তখন একশ দশ টাকা উদ্বৃত্ত রইলো। নব্বই টাকার তরকারি কিনে বাজার করা শেষ হয়। দুই হাতে সব কিছু নিয়ে হাটতে হাটতে রাস্তায় এসে রিকশায় উঠে বসলাম।

রিকশা চলমান হলো। ভালো এতোগুলো জিনিস কিনতে পেরে আপন মনে হাসতে লাগলাম। রিকশা এক সময় বাসার খুব কাছে এসে পড়ে। আজিমপুর কবরস্থানের কাছে চওড়া রাস্তাটায় রিকশাচালক পা প্যাডাল হতে ফসকে যায় এবং রিকশা কিছুটা ডানে যেতে থাকে। মুহূর্তেই আমাদের রিকশা পেছন থেকে আসা এক প্রাইভেট কারের সঙ্গে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বাম পাশে সামান্য সরে উল্টে যায়। আর আমি

ছিটকে কিছুটা শূন্যে উঠে রাস্তায় পড়ে যাই। কোমরে, হাত ও পায়ে এবং পেছনের মেরুদণ্ডে এমন অসহনীয় ব্যথা অনুভব করি যে মনে হয় যমদূত জানটা এক্ষুণি নিয়ে যাবে। ভাগ্যক্রমে রিকশাচালক তেমন আহত হয়নি। কিন্তু ব্যথা অসহনীয়, আমি জ্ঞান হারালাম।

হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফিরলে তখন মা, বাবা, ভাইয়া, আপুকে দেখলাম। শুনলাম আব্বু ও ভাইয়া অ্যাক্সিডেন্টের সময় ওখানে দাড়িয়েছিলেন।

ব্যথার তীব্রতায় আমাকে সারা দিন ছটফট করা থেকে রক্ষা করে নার্সের পুশ করা ঘুমের ইনজেকশন।

রাতে জ্ঞান ফেরার পর জানলাম, ডাক্তার এক্স-রে রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বলেছেন কোমরের হাড়-এ ফাটল ধরেছে। বড় অপারেশন করাতে হবে।

দুদিনের মধ্যে আমার অপারেশন করা হলো। প্রায় এক মাস হাসপাতালে থাকার পর সবার দোয়া, ডাক্তারদের চেষ্টা ও স্রষ্টার রহমতে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলাম।

আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করি। বড়আপুও বাসায় ঘন ঘন আসেন। মা, বড়আপুর হাত ও গলা যে খালি তা লক্ষ্য করলাম। দুজনকেই একত্রে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা হাতে সোনার চুড়ি ও গলার চেইন পরো না কেন?

মা ও আপু নির্বাক। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতেই কলেজ পড়ুয়া বড় ভাইয়া বললেন, তোর চিকিৎসার জন্য মা ও আপু তাদের গহনা তাতিবাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেছেন। আব্বু অফিস থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছেন।

ভাইয়ার কথা শুনে কেদে উঠি। ভাবলাম, আব্বুর লোন তো প্রভিডেন্ট ফান্ড হতে কাটানো যাবে। কিন্তু মা ও আপুর গহনাগুলো তো আর ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে দুজনের হাটুতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাদলাম।

তারা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

তারপর মনে মনে শপথ করি, কর্মজীবনে উপার্জিত অর্থ দিয়ে মা, আপুকে গহনা তৈরি করে দেবো। আর যতোদিন আমার শপথ পূরণ না হবে ততোদিন গহনা পরিয়ে কোনো নারীকে আমার ঘরে আনবো না। অর্থাৎ বিয়ে করবো না।

পিলখানা, ঢাকা থেকে

কমিশনার

– হাসান

২০০২ সালের রমজানের কিছুদিন আগের কথা। বন্ধু রনি অনেক দিনের ছুটিতে বাড়ি আসে। তখন প্রায় প্রতিদিনই তার বাসায় যাওয়া হতো। রনির বাসার কাছেই ছিল রুমা নামের এক মহিলা কমিশনারের বাসা। তার বাসায় আসা-যাওয়ায় সময় প্রায়ই কমিশনারের সঙ্গে দেখা হতো। তবে কোনো কথা হতো না।

খেয়াল করলাম, আমাকে দেখলেই সে শুধু হাসতো। তার এই হাসির কোনো মানেই বুঝতাম না। সে আমাকে কিছু একটা বোঝাতে চাইতো। কিন্তু বলতো না। অবশ্য তার সঙ্গে আগেই হালকা পরিচয় ছিল।

রনি একদিন তার কি কাজে যেন আমাকে নিয়ে কমিশমনারের বাসায় গেল। আগের পরিচয় থেকে আরেকটু ফৃ হলাম। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। কথা প্রসঙ্গে বললাম, আচ্ছা, আপনি আমাকে দেখলে শুধু হাসেন কেন?

রুমা বললো, হাসতে নিষেধ আছে নাকি? ভালোলাগে তাই হাসি।

তাকে দেখতে কিছুটা নায়িকা পপির মতো লাগে।

সে বললো, আপনারা মাঝে মধ্যে বাসায় আসবেন। গল্প করা যাবে।

মনে মনে ভাবলাম জানি না, কিসের গল্প করতে চান আপনি। সে দিনকার মতো আমরা চলে এলাম।

এরপর বন্ধুকে ফাকি দিয়ে প্রায়ই তার বাসায় এসে সময় কাটাতাম। নানান প্রসঙ্গে কথা বলতাম। লক্ষ্য করলাম, সে ক্রমেই আমার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি বসলে সে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতো। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল।

একদিন বিকেলে রনির বাসায় গিয়ে তাকে পেলাম না। আসার সময় গেলাম কমিশনারের বাসায়। অনেক ডাকাডাকি করলাম। কোনো শব্দ নেই। এক রুমে দেখলাম তার বাচ্চা ঘুমাচ্ছে, অন্য রুমে গিয়ে রুমাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম। সে শুধু ব্রা ও প্যান্টি পরে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে একটুও বিচলিত হলো না।

আমার ভেতরের অবস্থা ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে কিছুটা সংযত করে ফিরে আসবো। এমন সময় সে আমাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে বিছানায় নিয়ে গেল। চরম উত্তেজনায় তখন আমরা দুজন এক অজানা বিশ্বে হারিয়ে গেলাম।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

AMOUR

– বনিক

ফরাশি ভাষায় আমু (Amour)–র অর্থ ভালোবাসা। আমার কাছে এটি একটি স্পর্শকাতর শব্দ। জানি না অন্যের কাছে কি?

আমি তোমাকে ভালোবাসি, I love you, এ কথাটি কোনো অবিবাহিত সুন্দরী বালিকার কাছ থেকে শুনলেই মনের মাঝে কেন যেন কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছটফট শুরু হয়ে যায়।

প্রবাস জীবন কাটাতে ফ্রান্সের প্যারিসে আসি। আসার পর ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় কামনা করি। ফ্রান্সে পুলিশ ফরমে বিবাহিত কি না তা পূরণ করে দিতে হয়। তখন সহসাই রুমমেট এক বন্ধুর পরামর্শে বিবাহিত না হয়েও বিবাহিত লিখি। তারই পরিণতিতে পুলিশ কর্তৃক আমাকে দেয়া স্টে পারমিশন কাগজে *বিবাহিত* কথাটা যোগ হয়ে যায়।

প্যারিসে আসার তিন মাস পরে সতেরো আঠারো বছর বয়সের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় মেট্রট্রেনে। আমি তখন ফরাশি ভাষা বলতে পারি না।

মেয়েটা অল্প অল্প ইংরেজি বলতে পারে।

আমিও দ্রুত ইংরেজি বলতে পারি না।

প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে বুঝতে পারলাম, ভালোই হয়েছে। কেননা ধীরে ধীরে কথা বললে তার বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। সে আমার ফোন নাম্বার জানতে চায় এবং তার মোবাইল নাম্বারও আমাকে দেয়। মোবাইলে যোগাযোগ চলতে থাকে এবং মাঝে মধ্যে দেখা হয়। আমাকে নিয়ে সে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তার কাছ থেকে ফ্রান্স সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি এবং এও জানতে পারি সে জন্মসূত্রে ফরাশি, মা এলজেরিয়ান ও বাবা ফ্রেঞ্চ। তার নাম মিথোস সাকেলা।

আমি বাংলাদেশি এবং আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সে খুবই খুশি।

সে আমাকে প্যারিসের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা *আইফেল টাওয়ার* এবং প্যারিসের কাছেই *ডিজনিল্যান্ড*–এ নিয়ে যায়। সেখানে কোনো এক মুহূর্তে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে *জুতেম জুতেম* বলতে থাকে।

আমি সেই ফরাশি শব্দের অর্থ বুঝতে পারি না। বাসায় এসে অন্য বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি তার বাংলা অর্থ, *আমি তোমাকে ভালোবাসি।*

এভাবেই মন বিনিময় চলতে থাকে।

ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করার পর সরকার এক বছর পর্যন্ত ভাতা দেয়। তবে বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি দেয় না। তাই কাজ পাওয়া দুর্লভ হয়ে যায়।

ফুলের দোকানে পার্টটাইম কাজ করতো মিথোস সাকেলা। তারই একান্ত প্রচেষ্টায় সেখানে আমার সপ্তাহে তিন দিন কাজ করার সুযোগ মেলে। দোকানটি প্যারিসের Gare Du Nord (গার দু নর্ড)–এ। ফ্রান্সের বড় ট্রেন স্টেশনগুলোর মধ্যে এটি একটি। স্টেশনের আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল দোকানটি। নাম স্পেস ফ্লাওয়ার্স।

ভালোই দিন কাটছিল। সাকেলা আলাদা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতো। আমাকে অনেকবার অফার করেছিল তার বাসায় থাকার জন্য। কিন্তু রাজি হইনি লোক লজ্জার ভয়ে।

সে শেষ পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে তাকে আমার পুলিশের দেয়া স্টে পারমিশনের কাগজ দেখাতে গিয়েই সমস্যা বেধে যায় এবং ভালোবাসা পালিয়ে যায়। তাকে কোনোভাবেই সেই মিথ্যাভাবে লেখা বিবাহিত কথাটি আর বোঝাতে পারিনি।

তার কিছুদিন পর আমার কাজের স্থানে কন্ট্রোল হয়। কাজ চলে যায়। সেও সেখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

প্যারিস, ফ্রান্স থেকে

বরফ গলা জল

– শাহ্ আলম

নাম তার জ্যোৎস্না। যার জন্য হৃদয়ে ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল সেই শৈশবে। ক্লাস টু, থ্রি এক সঙ্গে ক্লাস করেছি আর অবাক চোখে নীরবে দেখেছি পরীর মতো সুন্দর মেয়েটিকে।

জ্যোৎস্না, তোমার কি মনে পড়ে, ক্লাস ফোর শুরুর প্রথম সপ্তাহেই তোমার বাংলা বই–এর ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম :

আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে স্নো দেবো, পাউডার দেবো, আয়না–কাকই–সাবান দেবো, পুতুল দেবো, বকুল ফুলের মালা দেবো। ভালোবাসো যদি, পার হবো নদী। এমন একটি চিঠি।

বোকা ছিলাম বলে, নাকি দুঃসাহসের কারণে আজও বুঝে উঠতে পারিনি ইতিতে *স্বীয় শ্রী!* নামটুকু লিখতে ভুলিনি। তাই বাংলার স্যার ক্লাসে আসার আগেই হাটে হাড়ি ভাঙলো। আমি অলক্ষ্যে চেয়ে দেখলাম মেয়েদের সারিতে কি যেন এক মহা আবিষ্কারের উল্লাস ছড়িয়ে পড়ছে।

এ কান সে কান করে মুহূর্তে বিষয়টা সারা ক্লাসের বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো এবং চিঠিসহ তোমরা দল বেধে চলে গেলে লাইব্রেরি রুমে। আমার তখন কি অবস্থা! কারো পক্ষেই সম্ভব না ভাষায় সেটা প্রকাশ করা। আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। এমন বোকামির জন্য পাথর হওয়া ছাড়া সেদিন কিইবা করার ছিল আমার!

তোমরা কখন আবার ক্লাসে ফিরে এলে বলতেও পারিনি। কোনোদিকে না তাকিয়েই আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি সমস্ত ক্লাসের চোখগুলো শুধু আমাকেই দেখছে। আমি যেন চিড়িয়াখানার খাচায় বন্দী আজব কোনো প্রাণী।

সংবিৎ ফিরে পেলাম স্যার যখন দেরি করে রুমে ঢুকলেন। রোল কল শেষ না হতেই দ্বিতীয় বিষয়ের ঘণ্টা পড়লো। স্যার চলে গেলে মনে হলো বিধাতা বুঝি আমার বুক থেকে এতোক্ষণ আটকে থাকা নিঃশ্বাসটুকু টেনে বের করলেন।

একটু পরেই হেড স্যার জোড়া বেত হাতে প্রবেশ করলেন। যদিও ইংরেজির ক্লাসটা স্যারের ছিল না। প্রথমেই তোমাকে প্রশ্ন করলেন, ইংরেজি বইয়ের নাম কি?

তুমি কি বলেছিলে, অনেক দিনের রুটিন ভেঙে সেদিন লক্ষ্য করিনি। আমি তো ব্যস্ত ছিলাম আমার নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের হিসাব-নিকাশে। দশ বারোজনের পরেই এলো আমার পালা। আমার আজও দিনের মতোই মনে আছে, আমি বলেছিলাম *ইংলিশ ফর টুডে, বুক টু*।

কিন্তু স্যার বললেন, আমি নাকি বলেছি *ফোর টুডে*।

কমপক্ষে দশবার আমি একই উত্তর দিয়েছি। তবু বিচারে শাস্তির রায়ই হলো। উকিল বিহীন আদালতে বিচারকের রায়ই শিরোধার্য। কারণ দণ্ডদাতা তো দণ্ডিতের জন্য অন্য একটি অপরাধের দণ্ড লিখে নিয়েই বিচারালয়ে এসেছেন। দণ্ডের ভারে সেদিন দুহাতের তালু, পিঠের চামড়া রক্তাক্ত হয়েছিল। আমি আজও অবাক হয়ে ভাবি, শরীর থেকে রক্ত ঝরলেও দুই চোখ দিয়ে এক ফোটা জল নামেনি কেন? কষ্টে নয়! আমার শুধু শ্রাবণের ধারার মতো ঝরতে ইচ্ছা করেছিল লজ্জায়। তবু পারিনি। কারণ, পাথর সে জল পাবে কোথায়? তারপর –

তারপরও এক সঙ্গেই কেটেছে কয়েকটি বছর। ফোর-ফাইভ-সিক্স-সেভেন-এইট-নাইট-টেন। বুকের ভেতর ভালোবাসা পুষে রেখে ক্রমেই কাছাকাছি এসেছি। তারপর কাজে-অকাজে দুজনার একান্তে কেটেছে কতো যে সময়! রজনীও হয়েছে পার মুখোমুখি বসে। কিন্তু কোনোদিনই মুখ ফুটে বলিনি অথবা বলতে পারিনি বুকের সে কথা।

এসএসসি-র পর হঠাৎ একদিন তুমি চলে গেলে অসম বয়সী এক মানুষের সঙ্গে। তোমার মতামতের খবর জানিনি। কিন্তু তোমার পারিবারিক উৎসব আর তোমার চলার রঙ জানিয়ে দিল তুমি অসুখী নও। তোমার সুখই যে আমার চিরদিনের কামনা। তাই আবারও নীরব হয়ে গেলাম।

এবার পাথরের মতো নয়, পাহাড়ের মতো। পাহাড়ের মতোই বুকের ভেতর জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করলো। সেই বরফ গলা জল আমার দুই চোখ বেয়ে নেমে এলো ঝরনাধারা হয়ে। বিস্ময়ের ব্যাপার, সাত বছর আগে যে আমি চেষ্টা করেও কাদতে পারিনি সেই আমার চোখ এখন এতো জল পেল কোথায়?

হাজিগঞ্জ, চাদপুর থেকে

ড্রাইভার

– শাহীনা শারমীন লাবণ্য

২০০২ সালের জুন জুলাই-এর দিকে হবে হয়তো। সে বছর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম তিন চার দিনের জন্য। আমার দাদার বাড়িটি নাটোর জেলার লালপুর থানায়। অনেকদিন পর বাবার সঙ্গে এসেছি। সময়টা বেশ ভালোই কেটেছে। এবার ফেরার পালা।

আমার বাসস্থান কুষ্টিয়ার সঙ্গে এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থার যোগাযোগ খুব একটা ভালো না। লোকাল ট্রেনগুলো করে ঈশ্বরদী যেতে হয়। তারপর ওখান থেকে বাস ধরে কুষ্টিয়া।

আমি আর বাবা লোকাল ট্রেন ধরে ঈশ্বরদী পৌছালাম এবং রিকশাযোগে বাসস্ট্যান্ডে এলাম। এবার বাসের অপেক্ষা। আমাদের মতো আশপাশে অনেক যাত্রী রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রও রয়েছে। দেখে তাই মনে হচ্ছে। তাদের স্বভাবমতোই ইয়ার্কি, হাসাহাসি করছে।

তাদেরকে খেয়াল না করে বা পাত্তা না দিয়ে বাবার পাশে এমন এক জায়গায় দাড়ালাম যেখান থেকে ছেলেগুলোকে দেখা না যায়। হয়তো ছেলেগুলো সে জন্যই ভেবেছিল বাসে ওঠার পর দেখবো কি করো। এরই মধ্যে বিশ পচিশ মিনিট পর পর এক একটা বাস আসছে। বাসগুলোর মধ্যে এতো যাত্রী যে, *তিল ঠাই নাহিরে অবস্থা*। যতো নামছে তার থেকে দশগুণ বেশি উঠছে।

এমনিতেই আমি বাসযাত্রা একদম পছন্দ করি না। কারণ, বাসের ধোয়ার গন্ধ আমার কাছে এতো বিশ্রী লাগে যে, আমি বমি করতে বাধ্য। তারপর সিটে বসা তো দূরের কথা, দাড়ানোর জায়গা থাকে কি না কে জানে।

এসব কিছু ভেবেই হয়তো বাবা বললেন, যে বাসে ভিড় কম তাতে যাবো, অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমরা দুজন, ব্যাগও একটা। কিন্তু পর পর কয়েকটা বাস চলে গেছে একই অবস্থা নিয়ে। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যস্থলে পৌছাতে দেরি হয়ে যাবে ভেবে বাবা পরের বাসের অপেক্ষায় থাকলেন।

নির্দিষ্ট বাসটি এলো। আমরা তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে নিলাম। বাসের পাদানিতে পা দিতেই আমাকে উঠতে হলো না। পেছন থেকে এমন একটা ধাক্কা পেলাম যে, ভিড়ের চাপে আমি একদম বাসের ভেতরে, মাঝখানে। কোনদিক যে বাবা আর কোথায় যে ব্যাগ কিছুই বুঝতে পারলাম না। আশপাশ খুজছি, না, বাবাকে হারাতে হয়নি। পেয়েছি।

বাবা বললেন মা, ওখানে থাকো। আমি আসছি।

এদিকে আমার অবস্থা তো কাহিল। সেই ছেলেগুলো উঠেছে। বাবা কষ্ট করে ভিড় ঠেলে আমার পেছনে এসে দাড়ালেন হয়তো তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে।

বাস বা ট্রেনের ভিড়ে ছেলেদের চাপে দাড়িয়ে থাকা মেয়েদের যে কি হতে পারে তা ভুক্তভোগীরাই জানে। বাবা তো পেছন থেকে রক্ষা করছেন। কিন্তু পাশে বা সামনের ছেলেদের ইচ্ছাকৃত ধাক্কার মাঝখানে দাড়াতে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা হয়তো বাবা বুঝতে পারছেন।

এদিকে বাসের ঝাকুনিতে বমি হওয়ার প্রথম পর্যায়ে চলে এসেছি। আমার মুখের ভেতর তেতো হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সবার মাঝখানে বমি হয়ে গেলে কি হবে তা পাঠক বন্ধু নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

পাশের সিটে একজন পয়তাল্লিশ পঞ্চাশ গোছের বয়স্ক লোক দেখে বাবা বললেন, তার পাশ ঘেষে দাড়াতে। লোকটিও বললেন, হ্যা মা, দাড়াও অসুবিধা নেই।

আমিও পরম নির্ভরতায় দাড়ালাম। কিন্তু একি, লোকটি আমাকে তার কাছে টানছেন এবং আমার উরুতে হাত দিচ্ছেন। আমার বাবার বয়সী কি তার থেকে বেশি হবে এমন একটি লোক যদি এমন করে তবে কেমন লাগে? তার মুখে এক গাদা থুথু ছিটিয়ে দিলেও গায়ের জ্বালা মেটে না।

বাবাকে বললাম, এখানে দাড়ানো যাচ্ছে না। বাবার হতাশা আর বিষণ্ন মুখটা দেখে নিজের সমস্যা বলতেও বিবেকে বাধছে। কারণ, তিনি তো কিছুই করতে পারবেন না। শুধু শুধু কষ্ট দেয়া। কিন্তু আমিও তো এভাবে পারছি না।

ঠিক সে সময় সামনে থেকে কে যেন বললেন, ওই আপার মনে হয় ওখানে দাড়াতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। বাসের সামনের সাইডে মহিলারা আছে, এখানে পাঠিয়ে দেন। সবাই একটু ওনাকে সাইড দেন।

নদীর মাঝখানে ডুবে যাওয়া মানুষের ভেসে ওঠার জন্য একটা ছোট্ট কাঠের টুকরো পেলে যা হয়, তখন আমার অবস্থাও তাই হলো। কে বললেন কথাটা ভাবতে ভাবতে সামনে এগিয়ে দেখলাম, স্বয়ং গাড়ির ড্রাইভারই বলছেন।

পাশে সব সারি ধরে মহিলারা বসে আছে। ওখানে কোনো জায়গা নেই। কারণ, সবাই ঠাসাঠাসি করে বসেছেন।

ড্রাইভারটি ইঞ্জিনের পাশে একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন, এখানে বসুন আপা, কোনো অসুবিধা হবে না।

সত্যিই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না দেখে বাবার দিকে তাকিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। বাবাও যেন আমাকে বসতে দেখে দুশ্চিন্তা মুক্ত হলেন।

বাস বা ট্রাক ড্রাইভারদের সম্পর্কে আমার একটা বাজে মনোভাব ছিল। ভাবতাম তারা মদ, গাজা না খেয়ে গাড়ি চালায় না। তাদের স্বভাব ও চরিত্র ভালো হয় না। কিন্তু এই লোকটিকে দেখে আমার সেই মনোভাবটি সম্পূর্ণ উবে গেল।

আশ্চর্য হলাম যখন লোকটি আমাকে বললেন, আপনার মনে হয় খুব খারাপ লাগছে। এক কাজ করুন, রাস্তার আশপাশের প্রকৃতির দৃশ্য, আকাশ দেখুন ভালো লাগবে। রাস্তার দিকে তাকাবেন না। তাহলে মাথা ঘুরবে আর বমিও লাগতে পারে।

সত্যিই দেখলাম আমার বমি ভাবটা আর নেই। আশপাশের দৃশ্যগুলো দেখতে আসলেই ভালো লাগছে।

আরো অবাক হলাম যখন পাকশির ফেরিতে তিনি আমার কাছে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি নিলেন।

অবশেষে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছালাম অর্থাৎ কুষ্টিয়াতে চলে এসেছি। বাসও ততোক্ষণে প্রায় খালি হয়ে গেছে। নেমে আসার সময় তাকে অনেক ধন্যবাদ আমি ও বাবা জানালাম।

সেদিন একই সঙ্গে আমি মন্দ ও ভালো মানুষ দেখলাম। কেউ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আর কেউ সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই ধরণীর বুক থেকে এখনো যে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কমে যায়নি সেদিন তার আবারও প্রমাণ পেলাম। কিছু কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র কিংবা বয়স্ক লোক একটি মেয়ের কাছ থেকে যে ভালোবাসা অথবা শ্রদ্ধাবোধ পেল না তাই পেল একজন অর্ধশিক্ষিত ড্রাইভার।

সেদিন তার মানবিক মূল্যবোধ, উদারতা, ভদ্রতা এবং সহানুভূতিতে ভরা সাহায্যের জন্য ঋণী হয়ে রইলাম। নাম না জানা শ্যামলী ডিলাক্স-এর সেই ড্রাইভার ভদ্রলোকটিকে আজ আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রথখোলা, কুষ্টিয়া থেকে

ব্যাঙ

– তাসমিয়া আক্তার শোভা

আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। স্কুলে চলছে প্র্যাকটিকাল ক্লাস। আমাদের জীব বিজ্ঞানের স্যার ছিলেন আওফেরস্যার। একদিন তিনি বললেন, তোমরা কেচো ও ব্যাঙ জোগাড় করো। তোমাদের প্র্যাকটিকাল করাবো।

অনেক খোজাখুজি করে কেচো পেলাম। কিন্তু ব্যাঙ পেলাম না। স্যার কেচো ব্যবচ্ছেদ করলেন। ব্যাঙ বাদ দেয়া হলো।

ব্যাঙ ব্যবচ্ছেদ করার সুপ্ত বাসনা ছিল আমার মনে। কিন্তু কি আর করা! স্যারের ধমকে আমার কাছে সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী ওই কিলবিল করা কেচো কেটেই ক্ষান্ত হলাম।

সামনের এসএসসি পরীক্ষা। বাইরে পাটি বিছিয়ে মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে পদার্থের অংক কষছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে আমার আব্বার কলিগের ছেলে আমার ক্লাসমেট সজীবের ডাক শুনলাম। এই শোভা, দেখে যা, একটা ব্যাঙ পেয়েছি।

এই শুনে আমি তো এক দৌড়ে পৌছে গেলাম তার কাছে। দুটো কাঠি দিয়ে অনেক কসরৎ করে নিয়ে এলাম ব্যাঙটিকে। সজীবকে বললাম চারটে পিন জোগাড় করতে। আমি একটি ব্লেড খুজে নিয়ে এলাম। তারপরে ব্যাঙটিকে কাটলাম। ব্যাঙের অনেক অঙ্গ বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। আমার ব্যাঙ কাটা দেখে আমার বড় বোন তো ওয়াক ওয়াক শুরু করে দিয়েছে।

ব্যবচ্ছেদ পর্ব শেষ। এবার সেলাই করার পালা। অনেক পুরনো সুই এবং সুতা দিয়ে সেলাই করতে বসলাম। কিন্তু আমার টানাটানিতে ব্যাঙের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ওলট-পালট হয়ে গেল। সেলাইয়ের পর দেখা গেল বেচারার বাম পাশের হৃদপিণ্ড ডানপাশে টিপটিপ করছে। ব্যাঙের এ অবস্থা দেখে সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু আমি খুব খুশি আমার হাতে প্রথম অপারেশন করা ব্যাঙটি এখনো বেচে আছে দেখে। যদিও মনটা খুতখুত করছিল হৃদপিণ্ডের হাল দেখে। কিন্তু অপারেশন তো সাকসেসফুল!

এরপর একটি পুরনো মাটির পাত্র দিয়ে ঢেকে হাত ধুতে বাসায় ঢুকলাম।

বাসায় ঢুকতেই মা বললেন, শুধু শুধু ব্যাঙটিকে কষ্ট দিলি।

তখন আমার একটু খারাপ লাগলো। ইশ! না জানি ব্যাঙটি কতো ব্যথা পেয়েছে।

হাত ধুয়ে এসে দেখি পাত্রটি উল্টানো আর ব্যাঙটি নেই। নিশ্চয় কোনো বাদর ছেলের কাজ। আশপাশে খুজতে লাগলাম, পেলাম না। কষ্ট লাগলো আব্বাকে ব্যাঙটি দেখাতে পারলাম না বলে।

কিছুদিন গেল। ঘটনাটি প্রায় ভুলেই গেলাম। কুয়াশা ঢাকা সকালে প্রাইভেট পড়তে যেতাম স্যারের বাড়ি। একদিন সকালে পথে দেখি আমাদের পোষা কুকুরের বাচ্চা কি নিয়ে যেন টানাটানি করছে। কৌতূহলবশত এগিয়ে গেলাম। দেখি একটি ব্যাঙ। মনটা চমকে উঠলো। আরো ভালো করে দেখলাম ব্যাঙটির পেট নীল সুতা দিয়ে সেলাই করা। ব্যাঙটি মরে শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছে।

মনের অজান্তে দুচোখে দুফোটা অশ্রু আবিষ্কার করলাম। বুঝতে পারলাম না এ অশ্রু কিসের? একটি ব্যাঙকে কষ্ট দেয়ার জন্য অনুতাপের অশ্রু, নাকি কষ্ট পাওয়া একটি ব্যাঙের প্রতি ভালোবাসা?

মনের অন্তঃস্তল থেকে কে যেন বলে উঠলো ভালোবাসা, এটাই ভালোবাসা, অন্য রকম ভালোবাসা। তবে আমার ভালোবাসার অশ্রু কুয়াশা ঢাকা প্রকৃতির জন্য কেউ দেখতে পেল না। ব্যাঙটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে আমার গন্তব্যে পা বাড়ালাম।

হাকিমপুর, দিনাজপুর থেকে

মানে

– এম.এস. চৌধুরী বাচ্চু

ভালোবাসা মানে প্রথম ভালোলাগা, তারপর ভালোবাসা।

ভালোবাসা মানে পার্ক, বিচ, বিনোদনের জায়গাতে হাতে হাত রেখে দুজনে আপন মনে কথা বলা আর একান্ত আপন মনে ঘুরে বেড়ানো।

ভালোবাসা মানে গভীর রাতে প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠি পড়া আর চিঠি লেখা।

ভালোবাসা মানে ডেটিংয়ের আগে দীর্ঘ অপক্ষোয় প্রহর গোনা।

ভালোবাসা মানে ডেটিংয়ের সময় সর্বদা ধরা খাওয়ার ভয় থাকা।

ভালোবাসা মানে নির্ঘুম রাত জাগা।
ভালোবাসা মানে সব সময় টেনশনে থাকা।
ভালোবাসা মানে প্রেমিকার বাবা–ভাইয়ের ভয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকা।
ভালোবাসা মানে প্রেমিক–প্রেমিকার কোলে মাথা রেখে সুন্দর সুন্দর প্রেমালাপ করা।
ভালোবাসা মানে পাওয়ার আনন্দ, খুশি–হাসি, সুন্দর জীবন।
ভালোবাসা মানে বিরহের যন্ত্রণা, দুঃখ–কষ্ট, বেদনাময় অশান্তি জীবন।
ভালোবাসা মানে অভিমান করে কথা বলা, সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা, চিঠি না দেয়া।
ভালোবাসা মানে প্রেমিকের হাত ধরে প্রেমিকার পলায়ন।
ভালোবাসা মানে চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে দুজনে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো।
ভালোবাসা মানে একান্ত আপন করে দুজনে সময় কাটানো।
ভালোবাসা মানে ছোট ছোট চিরকুট লিখে মেসেজ পাঠানো।
ভালোবাসা মানে পার্কে বসে বাদাম, বুট খাওয়া।
ভালোবাসা মানে ভুল বোঝাবুঝি।
ভালোবাসা মানে দুজনে মিলে আগামীর স্বপ্ন নিয়ে কল্পনার রাজ্য ঘুরে বেড়ানো।
ভালোবাসা মানে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার পর গরম কফি হাতে সময় কাটানো।
ভালোবাসা মানে ভালোবাসার বিনিময় ভালোবাসা।
ভালোবাসা মানে ভালোবাসা দিবসে দুজন দুজনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো।
ভালোবাসা হলো সুন্দর একটা সম্পর্ক যা ছোয়া যায় না, শুধু অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়।

রাউজান, চট্টগ্রাম থেকে

ম্যাকডোনাল্ডসে প্রেম

– জাহান মোহাম্মদ

সউদি আরবে তরুণ–তরুণীদের অবাধে মেলামেশা এবং এক সঙ্গে কোনো জায়গায় বসে প্রেমের ভাব লেনদেন করার মতো জায়গা তেমন নেই বললেই চলে। তবে দুই একটা যাও আছে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রেস্টুরেন্টই মোটামুটি নিরাপদ। তবে তা শতকরা একশ ভাগ নয়। তবুও তারা ঝুকি নিয়ে এই সব রেস্টুরেন্টে যায়। সেই রকম একটি রেস্টুরেন্টের নাম ম্যাকডোনাল্ডস। রিয়াদ শহরে এই রেস্টুরেন্টের অনেক শাখা আছে। তেমনই একটি শাখার নাম *হাই আল মাসিফ ম্যাকডোনাল্ডস।*

ওই রেস্টুরেন্টের তিন কিলোমিটারের মধ্যে এক সউদির বাসায় গত জুলাই মাসে হাউস ড্রাইভার হিসেবে চাকরি নিলাম। বাসায় যে কয়জন ছেলেমেয়ে আছে তার মধ্যে বড় মেয়ের বয়স বিশ একুশ। লেখাপড়া শেষ করেছে। সে মাঝে মধ্যে মার্কেটে এবং বান্ধবীর বাসায় যায়। তবে প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে সে ম্যাকডোনাল্ডসে যায়। রেস্টুরেন্টে পৌছার আগে গাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে। সাধারণত মার্কেটে এবং রেস্টুরেন্টে যাওয়ার সময় সঙ্গী হিসেবে তার মা একজন হাউসমেড–কে সঙ্গে দেয়। কোনো অবস্থাতেই ড্রাইভারের সঙ্গে একা যাওয়া নিষেধ।

রেস্টুরেন্টে সাধারণত দুই সেকশন থাকে। একটি সিঙ্গল, অপরটি ফ্যামিলি সেকশন। কোনো মহিলা সঙ্গে না থাকলে পুরুষদের জন্য সিঙ্গল সেকশনই ব্যবহার করতে হয়। মালিকের মেয়ে একা ফ্যামিলি সেকশনে ঢুকে পচিশ ত্রিশ মিনিট পর কিছু খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে গাড়িতে আসে।

এভাবে কয়েকদিন চলার পর সপ্তম দিনেই ঘটনাটা ঘটলো।

আজও যথারীতি দশটার দিকে গাড়ি ফ্যামিলি সেকশনের দরজার সঙ্গে দাড় করালাম। সে নেমেই ভেতরে ঢুকে গেল। গাড়িতে আমার সঙ্গে হাউসমেড।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করার ঠিক আগ মুহূর্তে হাউসমেড আমাকে বললো দেড় কিলোমিটার দূরে এক সুপারমার্কেটে যাওয়ার জন্য। আমি তাকে বললাম পাশেই পঞ্চাশ গজের মধ্যে পান্ডা সুপারমার্কেট থেকে বাজার সেরে ফেলার জন্য।

সে আমাকে বললো, মালিকের মেয়েই ওই দূরের মার্কেট থেকে বাজার করার জন্য বলেছে।

মালিকের মেয়ের হুকুম। সুতরাং পালন করতে হবে। বাজার সেরে প্রায় ত্রিশ মিনিট পর আবার ফ্যামিলি সেকশনের দরজার সঙ্গে গাড়ি পার্ক করলাম।

এর ঠিক পাচ মিনিট পর একটা জিএমসি গাড়ি আমাদের গাড়ির সঙ্গেই দাড়ালো। ওই দিকে তাকাতেই দেখলাম মতওয়ার গাড়ি। ধর্মীয় বিধির বাইরে যারা চলে তাদেরকে ধরাই *মতওয়া*-র কাজ।

গাড়িতে ড্রাইভারসহ তিনজন। একজন পুলিশের পোশাকে, বাকি দুজন জোব্বা পরা অবস্থায়। ড্রাইভারের পাশের সিটের জোব্বা পরা অফিসার লোকটা তাড়াহুড়ো করে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়লো। পাচ মিনিট পর ভেতর থেকে ধস্তাধস্তি ও শোরগোলের আওয়াজ শোনা গেল।

এই আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে জিএমসি-র বাকি দুজনও রেস্টরেন্টের ভেতরে ঢুকলো। তারপর এক চব্বিশ পচিশ বয়সের তরুণকে হাতকড়া পরিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দরজার বাইরে নিয়ে এলো। দেখলাম, সঙ্গে আমাদের মালিকের মেয়েও।

মেয়েটা কান্নাকাটি করছিল।

এবার গাড়ি থেকে আমাকে ডেকে আকামা ও গাড়ির চাবি নিয়ে নিল।

মেয়েটা প্রতিবাদ করলেও কোনো কাজ হলো না।

সউদি তরুণটাকে জিএমসি গাড়ির পেছনের অংশে যেখানে মালপত্র রাখা হয় সেখানে ধাক্কা দিয়ে ফ্লোরে বসিয়ে দিল। আমি ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলাম। আমাদের গাড়িতে পুলিশ ও অফিসার গিয়ে বসলো। সঙ্গে হাউসমেইড ও মেয়েটা। উভয় গাড়িই মতওয়া অফিসে নিয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নামার পর মেয়ে ও হাউসমেডকে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিল। আমাকে এবং তরুণটাকে ওয়েটিংরুমে নিয়ে গেল। তরুণটাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাড়ানোর জন্য বললো।

এরপর পুলিশ আমার কাছে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার পর অত্যন্ত নোংরা মন্তব্য করলো আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর পড়লো এক থাপ্পড় ও ঘুসি। আমাকেও দেয়ালের দিকে মুখ করে দাড়াতে বললো। আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগই দিল না।

রেস্টুরেন্টের ভেতরেই তরুণ-তরুণী উভয়ের কাছ থেকে মোবাইল, ব্যাগ ও অন্যান্য কাগজপত্র অফিসারটা কেড়ে নিয়েছিল।

এবার জিজ্ঞাসাবাদের পালা। প্রথমে তরুণটাকে অফিসারের রুমে ডেকে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা করার পর একটা কাগজে কিছু লিখে তার টিপসই নিল। আবার আগের জায়গায় এসে সে দাড়ালো।

এবার অফিসারটা মেয়েদের রুমে নিজে গিয়ে কিছুক্ষণ পর হাতে কাগজসহ বাইরে এলো।

পরে হাউসমেড-এর কাছ থেকে জানতে পারলাম জিজ্ঞাসাবাদের সময় মেয়েটা স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, তারা দুজন এর আগে বহুবার মোবাইলে কথাবার্তা বলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে-পরে উভয়েই নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে বহুবার মিলিত হয়েছে।

আমার আর হাউসমেইডের কোনো ভূমিকা না থাকায় আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মুক্তি দিল।

এবার উভয়ের অভিভাবকদের কাছে টেলিফোন করা হলো। ঘণ্টা খানেক পর আমাদের মালিক খুব উত্তেজিত অবস্থায় অফিসে পৌছালেন। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন আমার আর তার মেয়ের মধ্যেই ঘটনা হয়েছে। তাই তিনি আমাকে অফিসের ভেতরেই মারার জন্য গালাগালি করলেন।

তখন অফিসারটা বললো, তার কোনো দোষ নেই, আপনি আমার রুমে আসেন।

রুমে যাওয়ার পর উভয়ের টিপসই করা স্বীকারোক্তি মালিক নিজে দেখলেন। তার মেয়ে যে এতোদূর এগিয়ে যাবে তিনি কল্পনাও করেননি। তরুণটার সঙ্গে দুই এক কথা কি যেন বলে মেয়েটার মোবাইল, ব্যাগ ও গাড়ির চাবি নিয়ে আমাদেরকে গাড়িতে আসার জন্য বললেন।

মেয়ে ও হাউসমেড গাড়িতে গিয়ে বসলো।

আমি চাবির জন্য দাড়িয়ে রইলাম।

মালিক আমাকে গাড়ির চাবি দিলেন এবং বললেন, তার গাড়ির পেছনে পেছনে যেন বাসায় ফিরে যাই।

গাড়ির দরজার কাছে দাড়িয়ে ভেতরে বসা মেয়ের মুখে তার ব্যাগ ছুড়ে বললেন, অমাখ অর্থাৎ নোংরা।

বাসায় পৌছালাম। মেয়েটা ঘরের দোতলায় পৌছার পর কান্নাকাটির শব্দ আর উচু স্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।

পরে জানলাম মেয়ের মা মেয়েকে খুব বেশি মারধর করছেন। আর ভবিষ্যতে ওই পথে না যাওয়ার জন্য বারণ করছেন। মেয়ের মোবাইলটা তার মা নিয়ে নিলেন।

তারপরে প্রায় দুই মাস তাদের বাসায় ছিলাম। আর কখনো গাড়িতে বসে মেয়েটা কারো সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেনি। এভাবেই তার প্রেমের সমাধি রচিত হয়েছিল।

এই ঘটনার পর মেয়ে বাইরে যাবার সময়ে তার মা, দাদি বা কোনো ভাই অবশ্যই তার সঙ্গী হতো। মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আমার তেমন সুযোগ হতো না একমাত্র দরকারি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়া। তাই তার কাছ থেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রেম কাহিনী কোনোদিনই শুনতে পারিনি।

সউদি আরব থেকে

নেপালি মেয়ে

– এ.কে.এম আবু ইউছুফ

আলম তার কম্পানির মালিকের সঙ্গে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এসেছে। এখন থেকে সে ইনডিয়ার দার্জিলিং অফিসের প্রধান হিসেবে কাজ করবে। মালিক তাকে সঙ্গে নিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছে। এ দায়িত্ব পাওয়া মানে সুযোগ–সুবিধা কয়েকগুণ বৃদ্ধি এবং ইনডিয়ার বিভিন্ন রাজ্যসহ নেপাল, ভুটান ভ্রমণের অপার সুযোগ। এ চাকরি পাওয়ার আগে আলমের জীবনটাই এলোমেলো হয়ে পড়েছিল বেকারত্বের অভিশাপে। চাকরিটার কারণে এখন বেশ ভালোই আছে। তার উপর দার্জিলিংয়ে পোস্টিং! ইনডিয়ার পর্যটন স্থানগুলো পরিভ্রমণের কতো না বাসনা সেই ছোট বেলা থেকে। সে সুযোগ এখন হাতে আশায় আলম মনে মনে পুলক বোধ করে। কিন্তু তারপরও কোন আশংকায় তার বুকটা হাহাকার করছে বার বার?

নীল আকাশে ডানা মেলে বিমান চলে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে। তারচেয়ে বেশি গতিতে আলমের মন ছুটে যায় পেছনের দিকে প্রায় ঊনিশ বছর আগের ঘটনায়।

১৯৮৫ সাল। এক আত্মীয়ের পচিশ হাজার টাকা পৌছে দিতে হবে চট্টগ্রামে। আলম ভাবলো রাতের গাড়িতে ঢাকা গিয়ে পর দিন নিজের কাজ সেরে চট্টগ্রামে যাবে। পরদিন সকালে ঢাকায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে তাকে রাজারবাগস্থ হোটেল রেড স্টারে নিয়ে নববিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। গল্পগুজব শেষে

আলম গোসল করতে বাথরুমে ঢুকলে বন্ধুটি আলমের টাকা নিয়ে গিয়ে হোটেলের বকেয়া বিল পরিশোধ এবং কিছু কেনাকাটা করে ফিরে আসে।

না, টাকা তুমি অবশ্যই পাবে। তবে তুমি এখানে থেকে বাসাবোতে আমার জমি বিক্রি করে দাও। না হলে দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। বন্ধুটি বলে।

পরদিন বন্ধু তার স্ত্রীকে নিয়ে বাসায় চলে গেলেও এ হোটেলে আসা যাওয়া বন্ধ হয়নি আলমের। সে সময় নেপালি ছেলেমেয়েরা দল বেধে ঢাকায় আসতো। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত উচ্চবিত্তের এ সকল ছাত্রছাত্রী টুরিস্ট ভিসায় এলেও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে আফিম, গাজা, চরস নিয়ে আসতো আর দেশে নিয়ে যেতো বিশেষত বেবি সুট, শিশুদের পোশাক।

সায়মন নেপালি মেয়ে। দেখতে পুতুলের মতো এমনই এক টুরিস্ট দলনেতা। পরিচয়ের পর আলমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। প্রায়ই অন্যদেরকে বিভিন্ন কাজে পাঠিয়ে দিয়ে আলমের সঙ্গে আড্ডা দিতো। বেরিয়ে পড়তো ট্যাকসি নিয়ে ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলোর দিকে। পার্ক, রেস্তোরা, গাজীপুর, সোনারগাও, নারায়ণগঞ্জ, সাভার চষে বেড়ায় দুজনে। আলমের প্রেমে মেয়েটি এতোই বিভোর যে, জাতি-ধর্মের বাধা ডিঙিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখে। সে আলমকে নেপাল নিয়ে যেতে চায়। তার বাবা একজন মন্ত্রী, নেয়ার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক বলে সে মনে করে। দুজনের যৌথ ছবি নিয়ে সে পরিবারকে দেখায়। তেমন কোনো আপত্তি নেই বিধায় আলমের না সত্ত্বেও আলমের পাসপোর্ট তৈরি করায়।

বেকারত্বের অভিশাপে নিষ্পেষিত আলম প্রথমে ভাবে মন্দ কি, দারিদ্রতা থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। পরে অবশ্য অসহায় পরিবার, দেশ, জাতি, ধর্মের কথা ভেবে শিউরে ওঠে।

মেয়েটিকে পটানোর জন্য বাকপটু আলম অনেক গালগল্প করলেও মেয়েটি যখন প্রেমে পড়ে যায় তখন সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ওদিকে বন্ধুর জমি বিক্রি হয় না, আর এদিকে পালানোও হয় না।

সায়মন প্রতিদিনই আলমের বাড়িতে যেতে চায়। আলম এড়িয়ে যায়।

একদিন কাচপুর বৃজে টেকসি থেকে নেমে প্রাকৃতিক পরবেশ দেখতে দেখতে সায়মন বলে, লাকসাম কতো কিলোমিটার হবে? চলো নওয়াব ফয়জুন্নেছার বাড়ি আর মাকে দেখে আসি।

আলম বলে, দিনে দিনে ফিরে আসা যাবে না। বুঝানোর জন্য পথ বাড়িয়ে বলে। বলে বারোশ আশি কিলোমিটার। কিছুতেই ফিরে আসা যাবে না।

সায়মন জিনস প্যান্টের ব্যাক পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বের করে দেখেই লুকিয়ে ফেলে।

গাড়ি ফিরে চলে ঢাকার দিকে। কেউ কারো দিকে তাকায় না। সায়মন বিড় বিড় করে বলতে থাকে, যতো মিথ্যাই বলো, তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না কিছুতেই না।

আলম তাকিয়ে দেখে তার চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে অনর্গল। প্রকৃতপক্ষে আলম এখন আর তার অভাব, অসহায়ত্বের কথা বলেও মেয়েটিকে ফেরাতে পারছে না।

নেপালি ছাত্রছাত্রীদের একটি দল বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে। অলিখিত নির্দেশ, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সকল নেপালি টুরিস্টকে ঢাকা ছাড়তে হবে।

গতরাতে হোটেল থেকে বিদায় নেয়ার পর এখনো আলমের দেখা নেই। ফ্লাইট ছাড়ার আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি। ব্যাকুল সায়মন দলের একজনকে এয়ারপোর্টে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আর কয়েকজনসহ রেড স্টারের সামনে ট্যাকসিতে বসে কাদছে এবং ঘড়ি দেখছে।

ছুটতে ছুটতে আলম এসে হাজির হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে সায়মন। প্রকাশ্য রাস্তায় আলমকে চুমু খেতে থাকে বার বার।

জড়াজড়ি ছাড়াতে চেষ্টা করে আলম ব্যর্থ হচ্ছে। গাড়িতে বসা সায়মনের সঙ্গীরা সময় নেই বলে চিৎকার দিচ্ছে।

এক পর্যায়ে সায়মন দেখে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে কয়েকজন পুলিশ এদিকে আসছে। হঠাৎ সে গাড়িতে উঠে পলিথিনে মোড়ানো একটি পাসপোর্ট আলমের হাতে দেয়। গাড়ি চলতে থাকে।

পলিথিন খুলে আলম দেখে একটি চিরকুটে লেখা:

Welcome To Kathmandu
Simon

হস্টেসের কথায় আলমের চিন্তায় ছেদ পড়ে।

বিমানের অবস্থান তখন কোথায় আলম জানে না।

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা থেকে

জোক

– নাজরানা লোপা

আমি তোমায় অসম্ভব ভালোবাসি।

আমার মুচকি হাসি দেখে শুভ্র বললো, বিশ্বাস করো।

আমি জানি শুভ্রর এ ভালোবাসা কিসের প্রতি।

গতকাল থেকে আমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক। আমাকে অসহ্য লাগা শুভ্রর অসম্ভব ভালো লাগাতে পরিণত হয়েছে। সবই মেকি। দুই মাসের পরিচয়ে বিয়ে করে বছর না ঘুরতেই তার কাপড় ইস্ত্রি ঠিক না হলে, তরকারিতে লবণ কম হলে কতো কথাই না শুনেছি। এই তো সেদিন, আমার নতুন সংসার দেখার জন্য আমার বন্ধু–বান্ধবীরা এলো। শুভ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারিনি।

তারা চলে যাবার পর সে বললো, শোনো, তোমাদের বাসায় কি করেছো জানি না। তবে এখানে বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারবে না। এখন বিয়ে হয়েছে, সংসার করো।

ভাবতে অবাক লাগে, এই সেই শুভ্র যে কি না বিয়ের আগে আমাকে প্রতি কাজে উৎসাহ দিতো। আর এখন! এই তো গতকাল সকালে তার টাইয়ের নটটা ঠিক হয়নি বলে আমার যে বাবার গোষ্ঠি উদ্ধার করেছে তার দেয়া টাকাগুলো নিতে একটুও বাধছে না। সে চাইছে টাকাগুলো তার নামে করিয়ে নিতে। আমিও দিতে চাই তা কেবল সংসারের শান্তির জন্যই।

কিন্তু আমার ননদ দুটো শক্ত হাতে চেপে ধরেছে। তারা বলে, এ টাকায় সংসারের যে সুখ তুমি চাইছো তার চেয়ে অনেক স্বাচ্ছন্দে তুমি থাকতে পারবে এ সংসার ছেড়ে গিয়ে।

সব কিছুই বুঝি। তারপরও পুরনো জোক ছাড়ালে নতুন জোক ধরবে। তখন সেটার শক্তি ও উদ্যম হবে আরো বেশি।

পাইকপাড়া, ঢাকা থেকে

স্বপ্নের রঙ

– পুন্যি

খাবারের প্রতি ছিল তার খুব লোভ। খাওয়া যে মানুষকে এতোটা আকর্ষণ করতে পারে সেটা আমি তার কাছ থেকেই প্রথমে জানতে পেরেছিলাম।

খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে হ্যাংলামো আমার কখনোই পছন্দ ছিল না। প্রথমের দিকে তার এই আচরণগুলোর জন্য প্রচণ্ড অস্বস্তি হতো আমার। ভাবতাম সামান্য কিছু ভালো খাবার পেলে যে ছেলে বর্তে যায় তাকে এতো

পছন্দ করার কি থাকতে পারে? অথচ কিছুদিন পরেই টের পেলাম তার এই অসংলগ্ন আচরণ আর অদ্ভুত খেয়ালখুশিগুলোই তার দিকে আমাকে আরো বেশি টানতে শুরু করেছে। খাওয়াটাকে সে একেবারে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্রান্ত দুপুরে হোটেলের এক কোণায় ওয়েটার যখন একের পর এক প্লেট খাবার তার সামনে সাজাতে শুরু করতো, তখন তার চোখেমুখে এক উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখতে পেতাম। মাতৃত্বের এক গভীর অনুভূতি আমার ভেতরের সত্ত্বাকে কাপিয়ে তুলতো। মনে হতো তার এই সরল মুখটার দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর সব দুঃখকে অনায়াসে সহ্য করতে পারবো। প্রচণ্ড ইচ্ছে করতো তার খাবার ভর্তি মুখটাকে আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরতে।

সে আমাকে সমাজতন্ত্রের কথা শোনাতো। মার্কস–লেনিন–এর শক্ত কথা আর জীবন কাহিনী লাইনের পর লাইন আমাকে শুনতে হয়েছে রিকশায় বসে। পুজিবাদী শ্রেণীর মানুষগুলো সমাজের নির্যাতিত মানুষকে নিয়ে কিভাবে খেলছে সেটি বোঝানোর জন্য পড়তে বাধ্য করেছে গোর্কি থেকে দস্তয়োভস্কির মোটা মোটা কাঠখোট্টা বই। শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা বিকেলে শুনতে হয়েছে অতীত কালের আন্দোলনের কথা, ফরাশি বিপ্লবের কথা। ইচ্ছে করলেই এগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারতাম। কিন্তু তাকে সামান্য একটু খুশি দেখার জন্য পৃথিবীর সব অসাধ্যকে সাধ্য করে তুলতে পারতাম।

তাকে আশ্চর্য করে দিতে পারবো এই আশায় ফিওদর দস্তয়োভস্কির *ক্রাইম এবং পানিশমেন্ট* আমি টানা চল্লিশ ঘণ্টায় পড়ে শেষ করেছিলাম। তার সামান্য অনুগ্রহ, একটু প্রশংসার জন্য যে কতোটা ব্যাকুল হয়ে থাকতাম তা কাউকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তার সঙ্গে দেখা করার সময়ে নিজেকে কতো যত্নে সাজিয়েছি। কিন্তু কোনোদিন তার সামান্যতম দৃষ্টি ও আকর্ষণ করতে পারিনি। কৌশলে কতো দিন তার সামনে বুকের ওড়না ফেলে দিয়েছি। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টার ফল হয়েছে শূন্য।

আমার চারধারের মানুষগুলোর প্রশংসা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরিচিত অনেকেই আমাকে উর্বশী নামে ডাকতো। উদ্ধত বক্ষ, সরু নিতম্ব আর আকর্ষণীয় দেহ কাঠামোর জন্য আমি সমবয়সী মেয়েদের কাছে ঈর্ষণীয় ছিলাম।

রুমে যখন কাপড় চেঞ্জ করতাম তখন শমীআপু আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলতেন, *পুন্যি আমি যদি ব্যাডা হইতাম তয় তোরে বাড়ি থেকে ভাগায়া নিয়া গিয়া বিয়া করতাম।*

অথচ যার মুখে এই কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম সে কোনোদিন পরোয়াও করেনি।

সেদিন ছিল বৃষ্টিভেজা এক সকাল। কালো মেঘগুলো সরে গিয়ে আকাশ জুড়ে শাদা মেঘের পায়চারি। আর এর ফাক দিয়ে সূর্যিমামার উকি দেয়ার চেষ্টা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে।

পেছনে হঠাৎ শমীআপুর চিৎকার, পুন্যি, তোর বর এসেছে।

এ একটি বাক্যই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বুকের রক্ত ছলকে ওঠার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। সে কোনো একদিন আমার বর হবে শুধু এ ভাবনাটুকুই আমার রক্তে কাপন ধরিয়ে দিতো। কিন্তু আমি জানতাম, তাকে পাবো না। তাকে ধরে রাখার সাধ্য আমার নেই। তারপরেও কাচপোকা যেমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আগুনের দিকে ধাবিত হয় তেমনি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি।

যখন কেউ এসে বলতো, পুন্যি, তোর বর এসেছে তখন মনে হতো, চিৎকার করে সবাইকে সেটা জানিয়ে দিই। কিন্তু এমন সৌভাগ্য খুব বেশি দিন আমার জীবনে আসেনি। মাসে বড় জোর একবার আবার কোনো সময় মাসের পর মাস চলে যেতো কোনো পাত্তাই থাকতো না তার।

রিকশায় উঠেই সে বললো, পুন্যি, তুমি কি জানো, ক্যালকুলাসের অসীম সিরিজের ধারণা কোথা থেকে এসেছে।

বুঝলাম, আজ ক্যালকুলাসের পালা। আতঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, আমার আজ ক্যালকুলাসের গল্প শুনতে ভালো লাগছে না প্লিজ তুমি অন্য কথা বলো।

হাঃ, হাঃ করে হেসে ওঠে সাবিত আমার কথায়। হাসি কোনোমতে থামিয়ে বলে, তোমার মতো গোবর সমৃদ্ধ মস্তিষ্কের মেয়ের সঙ্গে কি অন্য গল্প করবো!

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। কতো সহজে সে আমাকে অবহেলা করছে। রুম থেকে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম, আজ যা বলবে তার প্রত্যেকটি কথা শুনবো।

নিশ্চিতভাবে জানি, সে এই দিনটির কথা ভুলে গেছে। আজ থেকে তিন বছর আগে ইউনিভার্সিটির বারান্দায় ঠিক এই দিনটাতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের আবার সবচেয়ে কষ্টের দিন।

ভেবেছিলাম আজকে আমি তাকে যে কোনো মূল্যে খুশি করবো আর কোনো এক সময় তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলবো সাবিত, তুমি কি একটুও বুঝতে পারো যে আমি তোমাকে কতোটা ভালোবাসি।

সে আবার ক্যালকুলাসের গল্প শুরু করে।

দাতে দাতে চেপে নিজের কষ্টটাকে কমাতে চেষ্টা করি। হঠাৎ করেই সাবিত গল্প থামিয়ে আমার হাতে একটা ঝাকি দিয়ে বলে, আমি ভেবে দেখলাম পুন্যি, তোমার সঙ্গে বেসিকালি আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এটা কন্টিনিউ না করাই ভালো। কারণ তোমাকে আমি কখনোই বিয়ে করতে পারবো না।

আমার মুখ ছিটকে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়লো, কেন?

সে বোঝাতে শুরু করে। পুন্যি, তুমি তো জানো, আমার জীবনের সবটুকুই নিউটন, আইনস্টাইন আর ক্যালকুলাসে ভর্তি। এর মধ্যে তোমাকে কোথায় রাখবো?

আমি থেমে যাই। সে জিজ্ঞাসা করে, কথা বলছো না যে?

নির্বাক হয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

আমার থেমে থাকা তার রাগকে বাড়িয়ে তোলে। হঠাৎ করেই আমার বুকে হাত দেয় সে। পাগলের মতো খামচে ধরে আমার ওড়না, ব্রাসহ বুকটাকে ছিড়ে ফেলতে চায়। বলে, চলো, আজ তোমার সঙ্গে সেক্স করবো। সেই সঙ্গে আমার ঠোট দুটোকেও কামড়ে ধরে।

জোর করে তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। দুই ফোটা জল আমার চোখের কোণা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

হ্যা, আমিও এটুকু আদর তার কাছ থেকে চাইতাম। তবে এভাবে নয়। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে মন্নুজানের সামনে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে কতোদিন মনে হয়েছে, ইশ! সাবিত যদি এখন একটা চুমু খেতো। কিন্তু সেটি সে কোনোদিনই করেনি। যেভাবে তাকে চেয়েছি সে কোনোদিনই সেভাবে আমার হয়নি। আর ও যেভাবে আমাকে চেয়েছে, আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আমাদের জীবনটা রেললাইনের দুটো সমান্তরাল পাতের মতো। পাশাপাশি অনেক দূর বয়ে যায়। কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারে না। সাবিত, তার এক মাথা এলোচুল নিয়ে ডিপার্টমেন্টে ক্যালকুলাস বই হাতে দৌড়াদৌড়ি করে অথবা রাত জেগে ইউনিয়নের পোস্টার লাগিয়ে বেড়ায়। আর আমি জানালার পাশে চুপটি করে বসে সর্বক্ষণ তার কথা ভাবতে থাকি।

দিন যায়, মাস যায়, আমার স্বপ্নগুলোর ওপর ধীরে ধীরে ময়লা জমতে শুরু করে।

রাজশাহী থেকে

নীরব যন্ত্রণা

– অপূর্ণ

মেয়েটার সঙ্গে জন্মের পর থেকেই পরিচয়। পরিচয় হওয়ার পেছনে কারণ ছিল, দুজনেরই পাশাপাশি বাড়ি। তাই মেয়েটির সঙ্গে গাঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই শিশুকাল থেকেই। প্রতিবেশী হওয়ার ফলে আমরা পাই অবাধ মেলামেশার সুযোগ। এক সঙ্গে গোসল করা, এক সঙ্গে আরবি পড়তে যাওয়া ইত্যাদি কাজ দুজনে এক সঙ্গে করতাম। হাড়ি–পাতিল দিয়ে বৌ–স্বামী খেলা সবই চলতো আমাদের মাঝে। অসংখ্য মেয়ে সঙ্গী থাকতেও বার বার তাকেই বৌ বানাতাম। কিংবা লুকোচুরি খেলার সময় লুকাতাম দুজন এক সঙ্গে।

প্রকৃত স্বামী–বৌ যা করে, দুজন ঠিক সেভাবে মিলেছি অসংখ্যবার। আমি এসব ব্যাপারে আনাড়ি ছিলাম। সে সম্ভবত একটু পাকাই ছিল। তাই তার ডাকে সাড়া দিতে কখনো বাড়ির গোয়াল ঘরে, ঝোপের আড়ালে, পুকুরে গোসল করতে করতে, কিংবা যেখানে লুকাতাম দুজন সেখানেই শুরু হয়ে যেতো সেই খেলা। বড়দের চোখের আড়ালে প্রায়ই চলতো এসব কাজ। যতোদিন ক্লাস সিক্সে না উঠি ততোদিন চলতে থাকে এভাবেই দুজনের। যদিও তখন বুঝতাম না তবুও এসব কাজ করে আনন্দ পেতাম প্রচুর।

ক্লাস সিক্সে ওঠার পর পরই চলে আসি ঢাকায়। ছোটবেলার সেই মধুময় প্রেম ভুলে যাই শহরের কৃত্রিম পরিবেশে। ঢাকায় থাকি বড় ভাইয়ের বাসায়। গ্রামে থাকে বাবা–মা। বাবা–মায়ের ছোট ছেলে হওয়াতে শহরে বেশি দিন থাকতে পারি না। ক্লাস এইটে ওঠার পর পরই আবার চলে যাই প্রিয় গ্রামে। ভর্তি হই থানা সদরের ভালো স্কুলে। মোটামুটিভাবে চলতে থাকে জীবন।

সদ্য শহর থেকে গিয়েছি বলে এতো সহজেই তার দিকে নজর পড়ে না। লক্ষ্য করি, এতোদিনে সে বেশ বড় হয়েছে। একটা পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। বেশ কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে আকৃষ্ট করার মতো তার সব রকম হাতিয়ার তৈরি হয়ে যায়। আমার সামনে এলেই সে ইচ্ছে করেই বুক লাফিয়ে আসতো। কথা বলতে গেলে বার বার তার বুকের ওড়না পড়ে যেতো শুধু আমার সামনে এলেই।

কিন্তু এতোদিনে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। আমাদের আর তাদের পরিবারের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে নীরব যুদ্ধ। রেষারেষি ভাব চলে এসেছে দুই পরিবারের মধ্যেই। তাছাড়া আমাদের পরিবারের চেয়ে তাদের পরিবারের অবস্থা খারাপ। তাই তার দিকে নজর দেয়া, নিজের কাছেই খারাপ লাগতে থাকে। তাছাড়া ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জন্য আমার প্রচণ্ড লজ্জা লাগে। এজন্য তার দিকে এগোনোটা ভালো মনে করি না। কিন্তু তার ওই দুটো হাতিয়ার দ্বারা আমাকে বার বার আঘাত করতে থাকে।

তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি। ততোদিনে সে পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হয়েছে। মনের অজান্তে একদিন তাকে বলে ফেলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সে আমার এ কথাটির জন্যই সম্ভবত অপেক্ষা করছিল। সে বলে ওঠে, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

তবে আমার ভালোবাসাটা পরিপূর্ণ ছিল না। আমার প্রধান টার্গেট ছিল তাকে একবার আপন করে পাওয়া। ছোটবেলার সেই আদিম খেলার মতো আবার খেলা। মোটকথা, বিয়ে না করেই বিয়ের সুখ পাওয়া। সেদিন রাত বারোটার সময় তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা হয় তাদের আম গাছের নিচে। দুরু দুরু বুক নিয়ে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে থাকি তার জন্য সেই আম গাছের নিচে।

এক সময় সে আসে। টুকটাক কথা হয়। সেদিনের সেই মুহূর্তটির কথা আজও আমার মনে পড়ে। সেদিন সত্যি সত্যি আমার বুক ভয়ে কাপছিল। প্রথম দিনই জেনে নেয় আমি তাকে বিয়ে করবো কি না?

মিথ্যা করে সেদিন আমি তাকে হ্যা বলি।

সে আমাকে জানিয়ে দেয়, তাকে যদি তার এসএসসি পরীক্ষার আগে বিয়ে দেয় তাহলে তার কিছুই করার থাকবে না। তবে যদি পরীক্ষার পরে দেয় তাহলে আমার জন্য জীবন দিয়ে দেবে।

সেদিন আর কিছুই করি না। তার দেয়া দুটো আম নিয়ে ঘরে ফিরি। বিশেষ কাজে চলে আসি ঢাকায় তার পরদিন।

কয়েকদিন পর ঢাকা থেকে গিয়ে জানতে পারি আমাদের দেখা করার ঘটনা তার এক খালাতো দুলাভাই দেখে ফেলেছেন। তাদের আম বাগানের কাছেই তার ওই খালাতো দুলাভাই ও বোনের ঘর। কথা বলি দুলাভাইয়ের সঙ্গে। আমার সঙ্গে দুলাভাই আছেন বলে জানান এবং আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন বললেন। তার সাহায্য নিয়ে সেদিন রাতে তাদের বাশ ঝাড়ের নিচে দেখা করি। সেদিনই তাকে নিবিড় করে কাছে পাই। তার বুকে হাত দিই, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই তাকে। কিছু সময় সে আমার কাছে থাকে। তারপর চলে যায়। আমার মনের আশাটা অপূর্ণ থেকে যায়।

সামনে আমার এসএসসি পরীক্ষা। তাই দেখা করা বন্ধ করি। মোটামুটিভাবে পরীক্ষা শেষ করি। আবার দেখা করার তারিখ করি। দুলাভাই কিভাবে যেন টের পেয়ে যান। সেদিন রাতে দুজন সেই বাশ ঝাড়ের নিচে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দুলাভাই লাইট মারেন আমাদের দিকে। ভয় পাই দুজনেই। ভেবেছিলাম অন্য কেউ। ফজলু হওয়াতে সাহস ফিরে পাই।

আবার দুজন একত্রিত হই। দুলাভাইয়ের উৎসাহেই তাকে নিয়ে বাশ ঝাড়ের নিচে পাটক্ষেতে যেতে উদ্যত হই। নিয়েও যাই। তার সালোয়ারের ফিতে ধরে টান দিই।

ঠিক তখনই জেগে ওঠে আমার ভেতরের প্রকৃত মানুষটা।

মনের ভেতরেই বলে ওঠে ছিঃ, তুই এটা কি করছিস? একটা মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করছিস। তুই তো তাকে বিয়ে করবি না। তাহলে কেন এই নিকৃষ্ট কাজটি করছিস। আর যদি একে কখনো বিয়ে করিস তাহলে এই কাজটি বাসর রাতের জন্য রেখে দে। শুধু শুধু কেন একটা মেয়ের কাছে দায়ী হয়ে থাকবি। কথাগুলো নিজের ভেতরে বার বার বলতে থাকে।

আমি উঠে পড়ি। নিজ হাতে তার সালোয়ারের ফিতে বেধে দিই।

বলি, আজ থাক। অন্যদিন হবে।

সে বলে, ঠিক আছে।

তবে তার কথা বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, সে কাজটি করতে আগ্রহী।

আমি কাজটি রেখে দিই বাসর রাতের জন্য। সেদিন থেকে ইচ্ছা জাগে তাকে বিয়ে করবো যেভাবেই হোক।

কয়েকদিন পর ঢাকায় আসি ঘুরে বেড়ানোর জন্য। এসএসসি রেজাল্ট হওয়ার কয়েকদিন আগে বাড়িতে যাই। দুই বিষয়ে ফেল করি।

সে তখন বলে, সামান্য এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করলে। এখন তো আমাকে বিয়েও করতে পারবে না।

তার এই কথাটি শুনে প্রচণ্ড কষ্ট পাই। তাকে বিয়ে করার জেদ আরো গাঢ় হয়। ফেল করার কষ্ট আর তার দেয়া কষ্ট নিয়ে আবার ঢাকায় আসি কয়েকদিন থাকার জন্য।

কষ্টগুলোকে হালকা করে প্রায় দুই মাস পর বাড়িতে যাই। বাড়িতে যাওয়ার পথেই দেখা হয় দুলাভাইয়ের সঙ্গে। তিনি বলেন আজ তার বিয়ে।

শুনে প্রথমে বিশ্বাস করি না। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি তাদের বাড়িতে অনেক লোকজন। বিশ্বাস হয় তখন।

তার কথা সে ঠিকই রেখেছে। সে বলেছিল, তার এসএসসি পরীক্ষার আগে যদি পরিবার থেকে বিয়ে দেয় তাহলে সে কিছুই বলবে না। সে যখন নাইনে পড়ছে তখন বিয়ে হয়। সম্ভবত একটুও আপত্তি করেনি। সে ভাবেনি আমার কথা, আমি কি নিয়ে বেচে থাকবো।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

এদরীছ

– কামরুন নাহার টগর

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমাদের তিন বান্ধবীর একটি দল ছিল। একজনের নাম পারভীন। পারভীন *মিস ওয়ার্ল্ড* না হলেও *মিস বাংলাদেশ*–এর মতো সুন্দরী ছিল।

আরেকজনের নাম দিপা। দিপা বিভাগীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ছিল।

আমি গানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছিলাম।

স্কুলের শিক্ষকরা পর্যন্ত আমাদের *ত্রিরত্ন* বলে ডাকতো। সুতরাং আমাদের ড্যামকেয়ার ভাবও ছিল তুঙ্গে।

আমাদের স্কুলের পাশেই ছিল কলেজ। তাই সহপাঠী থেকে শুরু করে কলেজের বড় ভাইয়েরা পর্যন্ত আমাদের পিছে ঘুর ঘুর করতো। কিন্তু তাদেরকে কোনো পাত্তা দিতাম না আমরা। পারভীন একটু পাত্তা দিতে চাইলেও দিপা আর আমি তাকে শাসন করতাম।

একবার জ্বরের কারণে তিন দিন স্কুলে যেতে পারিনি। চতুর্থ দিন ক্লাসে ঢুকে দেখি প্রথম বেঞ্চে বসে আছে একটি নতুন ছেলে। দিপার কাছে জানলাম, ঢাকা থেকে এসে নতুন ভর্তি হয়েছে।

কয়েকদিন ক্লাস করার পর দেখলাম ছেলেটি আমাদের কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে কোনো কথা পর্যন্ত বলে না। রাগে আমাদের মেজাজ গরম। কিভাবে তাকে হেনস্তা করা যায় সেই চিন্তাই আমাদের সার্বক্ষণিক। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ছেলে, তোমার নাম কি?

ছেলেটি বললো, মোহাম্মদ ইদ্রিস।

বললাম, এদরীছ?

সে বললো, এদরীছ বলছো কেন, আমার নাম ইদ্রিস।

বললাম, হলো আর কি!

যাক, এর মধ্যে রবীন্দ্র, নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তাকে দেখেছি প্রথম সারিতে বসে আমার গান শুনছে। তবে আমাদের ত্রিরত্নকে সে আগের মতোই নো পাত্তা। কিছু দিন পর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। আমাদের এদরীছ মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হলো। আর আমাদের ফলাফল খুবই খারাপ হলো। আমি গণিতে ছয়, পারভীন চার, দীপা শূন্য। তার ফলাফল শুনে আমরা তার প্রতি আরো ক্ষেপে গেলাম। সব শিক্ষকদের স্নেহ মমতায় এদরীছ এখন আরো বুক ফুলিয়ে হাটে।

আমার খারাপ ফলাফলের জন্য বাড়িতে বাবা খুব বকাঝকা করলেন। হারমনিয়াম আলমারিতে তালা দিয়ে রেখে বললেন, এই ছয় যদি ক্লাস টেনের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ষাট না হয় তাহলে তোমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেবো।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, পড়াশোনায় সিরিয়াস হবো।

আমাদের চেয়ে এই স্কুলে আর কেউ বেশি মূল্যবান হবে তা আমাদের সহ্য হবে কেন? আমরা চাই এদরীছ এ স্কুল থেকে চলে যাক। তাই ক্লাসে আসতে যেতে ধাক্কা মেরে বেঞ্চ থেকে তার বই মেঝেতে ফেলে দিতাম।

সে স্যারদের কাছে নালিশ করলে বলতাম, স্যার, ইচ্ছা করে ফেলিনি, পড়ে গেছে।

টিফিন পিরিয়ডে সবাই বাইরে গেলে তার বই-খাতা মাঝ বরাবর ছিড়ে রেখে দিতাম। এগুলো কেউ তো দেখেনি। তাই বিচারও দিতে পারে না। তবে আমাদের সন্দেহ করে সে চোখ কটমট করে তাকাতো প্রায়ই। তারপর থেকে বইয়ের ব্যাগ সঙ্গে সঙ্গে রাখতো এদরীছ।

স্কুল ছুটির পর আমরা তিন বান্ধবী এদরীছের পেছন পেছন হেটে খুব চুপিসারে ইউথ কলমের সব কালিটুকু ছিটিয়ে তার শাদা শার্টটি পৃন্ট করে দিতাম প্রায়ই।

রেজাল্ট ভালো করার জন্য অংক, ইংরেজি শিক্ষকদের কাছে দুবেলা প্রাইভেট পড়া শুরু করলাম। ইংরেজিস্যারের কাছে পড়তে গিয়ে দেখি সেখানে এদরীছও পড়ে। বাদ দিলাম ইংরেজি পড়া।

একদিন স্কুলের গেটে ঢোকার সময় এদরীছের সঙ্গে দেখা। এদরীছ খুব স্পষ্ট করে আমার মুখের ওপর বলে ফেললো, *মাকাল ফল, অংকে ছয়।*

ইচ্ছা হয়েছিল খুব জোরে তার গালে একটা চড় মারি। মুখ বুঝে সব সহ্য করে শুধু সুযোগ খুজতে লাগলাম। মনে এই অপমানের প্রতিশোধের স্পৃহা হাজারগুণ বেড়ে গেল।

তিন চার মাস পরের ঘটনা। ক্লাস করছি। হঠাৎ অনেক ভাজ করা একটি কাগজ ছেলেদের ওই দিক থেকে আমার গায়ে এসে পড়লো। কাগজটি লুকিয়ে রাখলাম। টিফিন পিরিয়ডে বাথরুমে গিয়ে পড়ে দেখি প্রেমের চিঠি। খুব জংলি ভাষা। চিঠিটির ভাষা ছিল এই রকম :

এই যে নায়িকা, গায়িকা, সুন্দরী, তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। তোমার কথা শুইতে, বইতে, খাইতে, নাইতে সব সময় মনে পড়ে। তোমাকে আমি ভুলতে পারি না।

ইতিতে কোনো নাম নেই। দিপা, পারভীনকে দেখালাম। লেখাটা অপরিচিত। ইদানীং এদরীছ আমার দিকে খুব বেশি তাকিয়ে থাকে। তবে এ লেখা তার হাতের নয়। তাছাড়াও শহরের ছেলে, এমন খিচুড়ি মার্কা ভাষাও তার হবে না নিশ্চয়ই?

তিন বান্ধবী গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। টিফিন পিরিয়ডে সবাই বাইরে গেলে ছেলেদের খাতার লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মেলাতে থাকি। হুমায়ুন নামের এক সহপাঠীর লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মিলে যায়। হুমায়ুনকে খুব আচ্ছা করে ধরি এবং সত্য কথা না বললে কমিটি ডেকে চিঠি দেখিয়ে বিচার দেবো বলে ভয় দেখাই। কারণ, দিপার বাবা স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন।

অনেক ভয়-ভীতির পর চিঠির কথা স্বীকার করে হুমায়ুন। বলে, এ চিঠি আমি লিখেছি। তবে ইদ্রিস আমাকে লিখতে বলেছে। ইদ্রিস বলেছে, টগরকে নাকি তার খুব ভালোলাগে। তার গানও খুব পছন্দ করে। তাই আমাকে একটি চিঠি লিখে টগরের গায়ে ছুড়ে মারতে বলেছে। আমি তাই করেছি।

এ কথা শুনে আমার খুব খুশি লাগছিল। এবার আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা। সিদ্ধান্ত হলো, হুমায়ুনকে মাফ করে দেবো শুধু সে স্যারের কাছে ইদ্রিসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এই শর্তে। বিচার দেবে ইদ্রিসকে যিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সেই অজিতস্যারের কাছে।

নির্দিষ্ট দিনে বিচার দিলাম। ছুটির পর বাদী-বিবাদী মোট পাচজনকে থাকার জন্য স্যার নির্দেশ দিলেন।

ছুটির পর শিক্ষকদের বসার রুমে বিচার শুরু হলো। এদরীছকে অজিতস্যার চিঠিটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, এই চিঠি লেখার জন্য হুমায়ুনকে তুমি বলেছো?

এদরীছ মাথা নিচু করে চুপ করে আছে।

স্যার এবার ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে আছো কেন? হ্যা, না কিছু বলো?

সবাইকে অবাক করে দিয়ে এদরীছ বলে ফেললো, হ্যা।

আর যায় কোথায়! স্যারের চোখ যেন বাঘের চোখের মতো হয়ে গেল। শুধু এদরীছকে ভেতরে রেখে আমাদের বাইরে চলে যেতে বললেন। বাইরে থেকে আমরা শুধু বেত্রাঘাতের সপাং সপাং শব্দ শুনছি আর খুশিতে বাকবাকুম করছি।

পরদিন থেকে এদরীছের স্কুলে আসা বন্ধ। ভাবলাম এবার ব্যাটা স্কুল ছাড়বে।

সপ্তাহ যায়, এদরীছ আর আসে না। এদরীছের খালাতো ভাই বাদল ছিল আমাদের সহপাঠী। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, এদরীছ কি অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে?

বাদল জানালো, স্যার যেভাবে ইদ্রিছকে মেরেছে তাতে সেদিন থেকেই তার অনেক জ্বর। এখনো ভালো হয়নি।

কথাগুলো শুনে এই প্রথম এদরীছের জন্য মনটা কেমন যেন একটু খচ খচ করে উঠলো।

দিপা বললো, এভাবে পেটানো স্যারের ঠিক হয়নি।

পারভীন বললো, ইদ্রিছকে স্যার খুব ভালোবাসতেন। তাই তার অপরাধে স্যার খুব দুঃখ পেয়ে এমন মেরেছেন।

বাদল বললো, সব দোষ তো টগরের, স্যারের কাছে বিচারটা না দিলে কি হতো?

এক মাস হয়ে গেল, এদরীছ আর স্কুলে আসে না। বাদলের কাছে স্যারেরা খোজখবর নিতেন।

বাদল জানালো, ইদ্রিস আর এ স্কুলে পড়বে না। তার মা তাকে আবার ঢাকায় মামার বাসায় রেখে পড়াবেন।

শুনে সব শিক্ষক খুব মর্মাহত হলেন। কারণ, এসএসসি–তে তাকে নিয়ে একটা ভালো ফলাফল স্যারেরা আশা করছিলেন। তাই প্রধান শিক্ষক দুজন সহকারী শিক্ষককে এদরীছের বাড়ি গিয়ে বিস্তারিত জেনে এবং তাকে বুঝিয়ে–শুনিয়ে স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য পাঠালেন।

তাতে কাজ হলো।

পরদিন এদরীছ স্কুলে এলো। তার সঙ্গে আর কোনো দুষ্টমি বা কথা আমরা বলিনি।

সামনে এসএসসি পরীক্ষা। তাই সবাই পড়াশোনায় খুব মনোযোগ দিলাম।

নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা শুরু হলো। একই রুমে সিট পড়েছে এদরীছের আর আমার। কিন্তু কেউ যেন কাউকে চিনি না এ রকমভাবে পরীক্ষা শেষ করলাম।

তিন মাস পর রেজাল্ট বের হলো। আমাদের এদরীছ স্টার মার্কস পেয়ে পাস করলো। আর আমি ফার্স্ট ডিভিশনে।

ঢাকায় হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে ভর্তি হলাম। গান শেখার জন্য ভর্তি হলাম মৌচাক মার্কেটের পাশে *হিন্দোল সঙ্গীত বিদ্যালয়ে।*

কলেজ ছুটি হলে স্যারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন গ্রামের সেই স্কুলে গেলাম। অজিতস্যার খুব গৌরব করে বললেন, ইদ্রিস তো ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছে।

তখন ঢাকা কলেজ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। তাই বললাম, আমিও ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি।

স্যার হেসে বললেন, তোমার কলেজ অন্য আর ঢাকা কলেজ হচ্ছে ঢাকায় নাম করা একটি ছেলেদের কলেজ। সেটার নামই হচ্ছে ঢাকা কলেজ।

খুব লজ্জা পেলাম। কেন জানি না এদরীছের প্রশংসা শুনে ভালোই লাগলো।

তবে তার সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ নেই। আমার গানের স্কুলে কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে উক্ত শিক্ষার্থীর নাম ও রোল লিখে কাগজ দারোয়ানের মাধ্যমে ভেতরে পাঠাতে হয়।

তিন চার মাস পরে এমন একটি কাগজ আমার নামে গেল। কাগজটি হাতে পেয়ে শুধু ভাবছি, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কে এমন ব্যক্তি! গেটে এসে দেখি এদরীছ দাড়িয়ে আছে।

তাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করলো। কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। শুধু প্রশ্ন করলাম, আমার রোল জেনেছো কিভাবে?

উত্তরে সে জানালো, জানার ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই জানা যায়। ইচ্ছাটাই বড়। এখন চলো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

এমন করে বললো যেন কতোদিনের সম্পর্ক আমাদের। কেমন জানি হয়ে গেলাম আমি। সব প্রতিহিংসা ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে একটি পার্কে গিয়ে বসলাম।

তারপর...।

আমি এখন এদরীছের দুই সন্তানের মা। এখনো মাঝে মধ্যে তাকে ক্ষেপানোর জন্য এদরীছ বলে ডাকি।

সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ থেকে

অকাল মৃত্যু

– এম. নিজাম

দুটি ভালোবাসার অকাল মৃত্যুর কথা লিখতে বসলাম। দুটিই আমার আত্মীয় সম্পর্কের লোকদের মধ্যে ঘটেছে।

এক.

আমার চাচা সম্পর্কের একজনের বাসায় একটি মেয়ে কাজ করতো। তারা যখন আনোয়ারাতে ছিল তখন মেয়েটির সঙ্গে একটি ছেলের সম্পর্ক হয়। সে সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। বিয়ের পর ছেলেটি পারিবারিক কারণে মেয়েটিকে নিয়ে আমার চাচার গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। এভাবে তাদের সংসার পাচ ছয় মাস চলার পর মেয়েটিকে অন্তঃসত্বা অবস্থায় রেখে ছেলেটি তার পরিবারের কাছে চলে যায়।

কিছুদিন পর মেয়েটির কোল জুড়ে আসে ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান। মোক্তার হোসেনের ছেলের নাম রাখা হয় শরিফ হোসেন। আজ আট বছর হতে চললো, শরিফ তার বাবাকে দেখেনি। তার নিষ্ঠুর বাবাও তাকে দেখতে আসেনি। শরিফের মা এখনো আমার চাচার বাসায় কাজ করে। শরিফ এখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। পিতৃস্নেহ ছাড়া সে আমাদের বাড়িতে সব কিছু পায়। এ পাওয়ারই বা কি আনন্দ!

দুই.

কলি ২০০২ সালে এসএসসি–তে রেজাল্ট খারাপ করে আর পড়ালেখা করেনি। ক্লাস টেনের ছাত্রী থাকার সময় তার সম্পর্ক হয় তার তালতো ভাই ইয়াসিনের সঙ্গে। তাদের সম্পর্ক এগোতে থাকে। এরই মধ্যে ইয়াসিন চলে যায় সউদি আরবে। কিন্তু তাদের সম্পর্ক এগিয়ে চলে। এ বছর কোরবানির পর বাড়িতে আসার পর তাদের কথা ছিল দুজনের বিয়ে হবে। কিন্তু রমজানের প্রথম দিকে ইয়াসিন যখন তার প্রবাস জীবনে নিজের হাতে ইফতারি তৈরি করতে গেলে আগে থেকে কখন যে গ্যাস লাইন ফেটে গিয়ে সারা বাসায় ছড়িয়ে পড়লো তা কেউ জানে না। ইয়াসিন যখন তার গ্যাসের চুলা অন করলো তখন সারা রুমে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। ইয়াসিনও পুড়তে লাগলো। ইয়াসিন যখন অন্ধকার ঠেলে রুম থেকে বের হয়ে এলো তখন সে আধমরা। তার রুমমেটরা হাসপাতালে নিয়ে গেল। চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ইয়াসিন সেখানে মারা গেল। ঈদের পর তার লাশ বাড়িতে এলে কলি সেখানে ইয়াসিনের আত্মীয়স্বজনকে বলে, ইয়াসিন যেভাবে মরেছে সেও সেভাবেই মরবে।

গত ২১ ডিসেম্বর কলির মা এবং ভাবী যখন তার প্রবাসী ভাইয়ের সঙ্গে ফোন করার জন্য পাশের ফোনের দোকানে গেল তখন কলি তাদের ঘরে থাকা কেরোসিনের বোতল থেকে তার সারা শরীরে কেরোসিন ঢেলে বাড়ির পাশের জমিতে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রতিবেশীরা যখন তার শরীরের আগুন নেভালো তখন সে আধমরা। সেও ইয়াসিনের মতো মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চার দিন পর চট্টগ্রাম মেডিকালে মারা গেল। কলি যেমন বলেছিল তেমন করলো।

ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম থেকে

আমরণ

পৃথিবীতে শুধু ভালোবাসাই বোধহয় এমন যা পেয়েও দুঃখ, না পেলেও দুঃখ। এই দুঃখ আর ভালোবাসা যেন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা। তারপরও এ ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই মানুষের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। কারণ, কষ্টের মাঝেই যে, ভালোবাসার অনন্ত সুখ। এর দেখা না পেলে জীবনটাই যে, অর্থহীন হয়ে দাড়ায়।

তার সঙ্গে যেদিন আমার সম্পর্ক শুরু সেদিন থেকেই সে ভীষণ সপ্রতিভ। অথচ ভেবেছিলাম তাকে জানতে, বুঝতে কিংবা তার কাছাকাছি হতে আমার বেশ সময় লাগবে। কিন্তু সেই আমাকে এতো দ্রুত আপন করে নিল যে, আমি তো ভীষণ অবাক। মনে মনে ভাবলাম, এই সাহসটা আগে কোথায় ছিল?

ভালোবাসায় প্রথম সাহসটা আমিই দেখিয়েছি। তার আচরণে কোনোদিন কোনো ভণিতা কিংবা ন্যাকামো আমি দেখিনি। যা বলে মন থেকেই বলে। যদিও তার ভালোবাসার প্রকাশটা আমার মতো এতো বেশি নয়। কিন্তু আমি জানি, সে আমায় ভীষণ ভালোবাসে।

আমরা দুজন দুজনকে খুব বেশি ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র খাদ নেই। বিশ্বাসই ভালোবাসাকে খাটি করে তোলে যা আমাদের মধ্যে আছে পুরো শত ভাগই। পরম বিশ্বাসেই নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেছি তার মাঝে। আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে শুধু তারই নিবিড়, নিষ্পাপ স্পর্শ। সেও তার সবটাই আমাকে দিয়ে দিয়েছে। ভালোবাসা যদিও ন্যায়-অন্যায় বোঝে না তবুও আমরা জানি, আমরা কোনো অন্যায় করছি না। আমাদের দুজনের মনের মধ্যে তো কোনো পাপ নেই। তবে এভাবে ভালোবাসায় কেন অন্যায় হবে?

ভালোবাসায় হারানোর ভয় থাকবেই। নিয়তিতে আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস। জানি না, নিয়তি আমাদের নিয়ে কি খেলায় মেতে উঠেছে। শুধু জানি, বিশ্বাস করি, আমরা দুজন চিরদিনই দুজনার থাকবো।

আমার ভয় হয় শুধু মৃত্যুকে ঘিরে। যখনই ভাবি, এ মরণই একদিন আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তখন মনে প্রশ্ন জাগে একটাই, মানুষ কেন অমর হলো না?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

টেস্টটিউব বেবি

– জালাল উদ্দিন

আমার ভালোবাসার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার পর ২০০১ সালে ঠিক করেছিলাম আমি আর আছমা ২০০২ সালের শেষ দিকে বাচ্চা নেবো। কিন্তু ২০০২ সাল শেষ হবার পরও আছমার শরীরে বাচ্চা আসার কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। সে জন্য আমরা দুজনই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার একগাদা টেস্ট করিয়ে রিপোর্ট দেখে বলেছিলেন, বাচ্চা না হবার জন্য কোনো কারণ নাকি তিনি খুজে পাচ্ছেন না।

তারপর থেকে টের পেয়েছি আমার আম্মা কি রকম জানি হয়ে গেছেন। আম্মার কথা অনুযায়ী তার সঙ্গে পীর সাহেবের কাছেও গিয়েছি। পীর সাহেব আমাকে ও আছমাকে দুটি তাবিজ দিয়েছিলেন। সঙ্গে এক বোতলে পানিপড়াও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি আর আমার স্ত্রী যেন সে পানি গোসলের পানির সঙ্গে মিশিয়ে গোসল করি।

এসব ছাড়াও আছমাকে নিয়ে মাজারে গিয়েছি। ফকিরকে শিরনি দিয়েছি। মাজারের বাক্সে টাকা দিয়েছি। তবুও কিছু হয়নি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের দ্বিতীয় বিয়েবার্ষিকীর রাতে আমাকে আছমা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার কি খুব মন খারাপ হচ্ছে?

তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন?

আছমা বলেছিল, এই যে বাচ্চা হচ্ছে না।

তখন বলেছিলাম, দূর, এসবের জন্য মন খারাপ করবো কেন? অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের পর কয়েক বছর বাচ্চা হয় না। চার পাচ বছর পর সব ঠিক হয়ে যায়।

আমি আছমাকে যতোই বলে থাকি না কেন, বাচ্চার জন্য মন খারাপ হয়নি এটা ঠিক ছিল না। বিয়ের পর প্রত্যেক স্বামীই চায় তাদের একটা বাচ্চা থাকুক। সেটা ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন।

আপ্রাণ চেষ্টা করি, ভুল করেও যেন আছমাকে কটু কথা বলে না ফেলি। কারণ, আছমার সঙ্গে আমার ভালোবাসার প্রথম সময়কালীন দুজনই পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, দুজনের কেউ কখনো জেনে বা না জেনে কাউকে দুঃখ দেবো না।

বাচ্চা না হবার ব্যাপারটা আমি আর আছমা কষ্ট করে হলেও মেনে নিয়েছি। কিন্তু পরিবারের কেউ মেনে নেয়নি। আছমাকে কোর্ট ম্যারেজ করার সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি। কোর্ট ম্যারেজ করে সোজা বাড়িতে চলে এসেছিলাম। অনেক বোঝানোর পর আম্মা আমাদের বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। সেই থেকে পরিবারের সবাই আছমাকে অন্য চোখে দেখেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মনে করেন, তাবিজ-কবজ করে আছমা আমার মাথাটা বিগড়ে দিয়েছিল। সে কারণেই তাকে বিয়ে করার জন্য এমন পাগল হয়েছিলাম।

দুজন ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তারের কথা ছাড়াও ম্যাগাজিন পড়েছি। সেসব থেকে জেনেছি, একজন পুরুষের এক মিলিমিটার বীর্যে চার কোটি চল্লিশ মিলিয়ন শুক্রকীট থাকে। কিন্তু এর সংখ্যা অর্ধেকের কম হলে সে পুরুষটি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়ে যায়। সে জন্য আমি ও আমার ভালোবাসা আছমা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা টেস্ট টিউব বেবি নেবো।

আমাদের এ সিদ্ধান্ত শুনে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মসাহিদ ও তার স্ত্রী হাসিনা প্রতিবাদ করে বলেছিল, এটি নাকি নাজায়েজ কাজ।

তখন তাদের ভুল ভাঙানোর জন্য ডাক্তার ম্যাগাজিনের সংখ্যা নিয়ে ওদের ভুল ভাঙিয়েছি। তাদেরকে বলেছি, অনেকেই মনে করে, বেগানা পুরুষের বীর্য থেকে শুক্রাণু নিয়ে টেস্ট টিউবের ভেতর সন্তান তৈরি করা হয়। এটা খুব ভুল ধারণা।

টেস্ট টিউব সন্তান নিতে যে কাজটি করতে হয় তা হলো, স্বামীর বীর্য পরীক্ষা করে সেখান থেকে জীবিত শুক্রানু নিয়ে মায়ের ডিম্বানু জঠর থেকে বের করে এনে বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত কাচের ছোট পিরিচে সেটা নিষিক্ত করে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর সুস্থ-সবল, একাধিক ভ্রূণ (দুই তিনটি) মায়ের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে মায়ের গর্ভ সঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়। এবং টেস্ট টিউবে নিষিক্ত ভ্রূণ নিয়ে মাতৃজঠরে আর দশটা শিশুর মতো স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে এই শিশুরা। নয় মাস পর সাধারণ যে কোনো হাসপাতালে কিংবা ক্লিনিকে

অন্য দশজন স্বাভাবিক মায়ের মতো এই মায়েরাও সন্তান প্রসব করেন। এতে কোনো অধর্ম নেই, নেই কোনো ছলছাতুরির অবকাশ।
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনটি-র কথাগুলো হুবহু বলার পর মসাহিদ ও হাসিনার ভুল ভেঙেছে। তারা সমর্থন জানিয়ে বলেছে, আমাদের দুজনের ভালোবাসার ফসল যেন আমরা ঘরে তুলি।
আমরা আমাদের ভালোবাসার ফসল তোলার অপেক্ষায় আছি।

কামার কাপন, মৌলভীবাজার থেকে

সবার জন্য

– খোরশেদ আলম খোকন

অনেকেই বলেন, দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে ভালোবাসার সৃষ্টি। আমি বলি, ভালোবাসার কারণেই দুনিয়ার সৃষ্টি। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে ভালোবাসার জন্যেই আল্লাহপাক দুনিয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। না হলে এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিই নাকি হতো না।
ভালোবাসা স্বর্গীয়, স্বর্গ থেকে এর উৎপত্তি হলেও মর্ত্যের মধ্যেই যতো ইতিহাস এই ভালোবাসার। এ কারণে বলা হয়, ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর। যার মধ্যে ভালোবাসা নেই সে নাকি পশুর সমতুল্য। আমরা সাধারণত ভালোবাসা বলতে বুঝি ছেলে-মেয়েতে যে সম্পর্ক হয় তা আস্তে আস্তে তরল থেকে বায়বীয় হয়ে কঠিন পদার্থে রূপ নিয়ে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। আসলে কি তাই? আমার তো মনে হয়, ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিংবা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কোথায় নেই ভালোবাসা? তা কেবল উপলব্ধির ব্যাপার। কথায় বলে, *ভালোবাসার ফাদ পাতা ভুবনে।*
কে কখন পটে যায় কে জানে? এটাই সত্য।
একজন ছেলের সঙ্গে যে কেবল মেয়ের ভালোবাসা হবে তা নয়। ভালোবাসা হতে পারে সার্বজনীন। মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কিংবা ভাইয়ের সঙ্গে বোনের, ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।
গ্রাম ছেড়ে যখন শহরে আসি তখন গ্রামের বন্ধুদের জন্য খারাপ লাগতো। খারাপ লাগতো মামাতো বোনটির জন্য যার সঙ্গে নানাবাড়ি গেলে খেলতাম। হাই স্কুল ছেড়ে যখন কলেজে পা দিলাম তখন পেছনে ফেলে আসা স্কুলটির জন্য, সেই স্কুলের সহপাঠীদের জন্য খারাপ লাগতো। এসবই ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি। ফার্স্ট ইয়ারে সুন্দরী পারমিতাকে দেখে মনের মাঝে যে ঢেউ খেলতো, এখন বুঝি সেই অনুভূতিও ছিল ভালোবাসা। রাজশাহী থেকে সোহেল নামে এক ছেলে রাঙামাটি এসে পাচ বছর ছিল। তারপর রংপুর চলে গেল। তার চলে যাওয়াতে খুব কাদলাম। প্রিয় বাবার মৃত্যুতে দারুণভাবে হতাশ হয়েছিলাম। এসবই তো ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি। জীবিকার তাগিদে একদিন পাড়ি দিলাম ইউএই-তে মা-বাবা, ভাই বোনদের কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে বিমানে উড়াল দিলাম।
ইউএই-র পথে উড়ালের সময় হ্যাচকা একটা টান, বিমান নয় যেন আমার বুকের মধ্যেই এই টান। বুঝতে পারি এও এক ভালোবাসা প্রিয়জনদের এবং দেশের প্রতি। বিমানবালাদের কিছুক্ষণের আতিথেয়তা যাত্রীদের জন্য। সেও কি ভালোবাসা নয়? যায়যায়দিন সব সময় পাঠকদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা আহ্বান করছে আর পাঠকরা লিখছে মন খুলে। যাযাদির প্রতি পাঠকদের কিংবা পাঠকদের প্রতি যাযাদির এও কি ভালোবাসা নয়? এতো ভালোবাসার মধ্যে যে ভালোবাসা কোনোভাবে খাটো করে দেখার নয় তা হচ্ছে

দেশের প্রতি এবং মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা। সবাই দেশ এবং মা-বাবাকে ভালোবাসুন। দেখবেন, জীবন ভরে উঠবে ভালোবাসায়।

ইউএই থেকে

উপহার

– মোশাররফ হোসেন ঢালী

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে এ কথা কখনো বলবো না আবার *তোমাকে করেছে রানী* এ কথাও কখনো বলবো না। কারণ, এ পর্যন্ত কাউকে ভালোবাসতে পারিনি। তবে জীবন চলার পথে অনেক মেয়েদেরকেই ভালো লাগতো। ভালো লাগতো চেয়ারম্যানের মেয়ে শম্পাকে। তার রেশম কালো কেশ, কাজল কালো চোখ, উচ্ছল তারুণ্য আমাকে শিহরিত করতো। আবার ভালো লাগতো নাজুস্যারের মেয়েকে যার ছল ছল চাহনি, সুরেলা কণ্ঠ আমাকে রঙিন স্বপ্ন দেখাতো। ভালো লাগতো হুদা সাহেবের মেয়েকে যার মায়াবী চেহারা, স্মার্ট ফিগার, গালে টোল পড়া হাসি আমাকে গভীর সাগরে হাবুডুবু খাওয়াতো।

আমার ভালো লাগা মাত্র এই জনেক তিন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল না। নাম না জানা আরো কতো মেয়েদের ভালো লাগতো। তাই স্কুলমুখী ছাত্রীদের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে থাকতাম। এসব ছিল কেবল পাটগ্রাম পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। এখন আসা যাক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

সময়টা ছিল ১৯৯৩ সালের ৭ ডিসেম্বর, রোজ বৃহস্পতিবার। জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে থাইল্যান্ডে *দি প্যারিস হোটেলে* অবস্থান করছিলাম। সেখানে একটি মেয়েকে প্রথম দেখাতে অবিশ্বাসী চোখের পাতা উল্টিয়ে এক নিঃশ্বাসেই ভালো লেগে গেল। লক্ষ্য করলাম প্রায় সময়ই তাকে হোটেল লবিতে ঘোরাঘুরি করতে।

ভালোলাগার কথা বন্ধু মোস্তফার কাছে ব্যক্ত করতেই মুচকি হেসে বলেছিল, রিসেপশনে হাজার বারোশ *বাথ* দিয়ে এলেই তোর ভালো লাগা বাস্তবে রূপ নেবে।

তখন আমার বোঝার আর বাকি ছিল না।

সময়ের তারতম্যে আমার বয়সের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালা লামপুর, সেখানেও ভালোলাগতো অনেক সুন্দরী ললনাদেরকে। আবার লম্বা কোনো ছুটি পেলেই চলে যেতাম জাহুরবারুর শূন্য পয়েন্টে। সেখানেও দেখতে পেতাম সিংগাপুরের সুন্দরী মেয়েদের। খুবই ভালোলাগতো উন্নত দেশের উন্নত মেয়েদের দেখতে।

সময়ের বিবর্তনে আজ অবস্থান করছি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবু ধাবি-তে। এখানেও দেখতে পাচ্ছি অপূর্ব সুন্দরী, মুক্তার মতো উজ্জ্বল অনেক তরুণী যাদের এক দেখাতেই ভালো লেগে যায়। আর এই ভালো লাগা থেকে ভালোবাসার প্রপোজ করতে গেলেই প্রথমত. আপনার থাকতে হবে ব্যাংক ব্যালান্স, থাকতে হবে ২০০৪ মডেলের গাড়ি এবং বিলাসবহুল বাড়ি। তবেই আপনার ভালোবাসার আবেদনটা মঞ্জুর হতে পারে। মতান্তর অবশ্যই থাকবে যেটা আমাদের মতো সাধারণ চার তারা হোটেলের কর্মচারী হয়ে স্বপ্ন দেখাটা অনেকটা গোধূলি লগ্নে ভোরের স্বপ্নের মতো।

তাই তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি কখনো ভালো লাগার পর ভালোবাসবো না। বরং ভালো লাগার পর বিয়ে করে ভালোবাসবো। এতে নেই কোনে রিস্ক, যাকে বলে একেবারে নিশ্চিত। আর ভালো লাগার পর ভালোবেসে বিয়ে পর্যন্ত গড়াটা অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর। অনেকটা লটারির মতো দশ টাকায় ত্রিশ লাখ টাকা পুরস্কার, তাই নয় কি?

আমাদের আবেগে ভরা গরিব দেশের অনেক যুবক ভাইয়েরা সাত–পাচ না ভেবে কোনো মেয়েকে ভালোবাসে। প্রথমত. কয়েকটা দিন হাসি–খুশিতে যায়, রঙিন রঙিন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন এই ভালোবাসায় মরীচিকা ধরে তখন ওই মধুর ভালোবাসা বড়ই ভয়ংকর পরিণতিতে রূপ নেয়। প্রমাণ স্বরূপ, আমাদের দেশের পত্রিকাগুলো যার পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ে, অনেক ছ্যাকা ডায়ালগ। যেমন *তুমি আজ নেই বলে নিদ্রাহীন রাত আর অবারিত অশ্রু সঙ্গী হয়ে রইলো জীবনে। তুমি আজ নেই বলে অবাক হৃদয় নিয়ে থমকে আছি অনন্ত বিরহ তীরে। তুমি আজ নেই বলে বেছে নিয়েছি মাদকাসক্ত জীবন। তুমি আজ নেই বলে কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি হতাশার যন্ত্রণায় ইত্যাদি।*

মোট কথা, ভালোবাসতে হলে অসম্পূর্ণতা নয়, বরং পরিপূর্ণতা নিয়েই ভালোবাসা উচিত। তার জন্য প্রয়োজন বাস্তববাদিতা, উদারতা এবং সচ্ছলতা যার কিছুটা হলেও সেই অর্জিত সফলতায় পৌছাতে পেরেছি। তাই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে ছুটিতে দেশে গিয়ে বিয়ে করে ভালোবাসবো।

আবু ধাবি থেকে

তুলসী পাতা

– বুড়ি

হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে ফোনে কথা হলো। তবে দেখা হয় কয়েক মাস পর। তার পূর্বসূরির সঙ্গে আমার পূর্বসূরির খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হলে প্রথমে পারিবারিকভাবে কোনো সমস্যা হয়নি। তিনিই ফোন করতেন। আস্তে আস্তে তা বাড়িয়ে দিলেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময়ে ফোন করতেন। অধিকাংশ দিনেই তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা কথা হতো। যেহেতু তাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আছে, তাই পারিবারিক আলোচনাই তার সঙ্গে বেশি হতো।

ধীরে ধীরে তার অতীত জানলাম। প্রায়ই কথাবার্তার মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন এবং বলতেন, খোদা যা করেন, ভালোর জন্যই করেন, যা হারিয়েছি এর জন্য কোনো কষ্ট নেই। এতে হয়তো আমার অমঙ্গল হতো। যা পেয়েছি তা নিয়েই খুশি, তা নিয়েই সুখী হতে চাই, নিশ্চয়ই এতে আমার মঙ্গল আছে। অবশ্য মানুষ যখন যা চায় তা পায় না। আবার যা পায় তা হয়তো কখনোই চায়নি।

বুঝলাম তার অতীত ভালোবাসাকে হারালেও তার দুঃখ নেই।

ইতিমধ্যে জানলাম সে মাদকসেবী। সিগারেট নিত্যসঙ্গী। আর উৎসব ছাড়াও মদ সপ্তাহে তিন দিন। তার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালাম এবং ধীরে ধীরে এসব ছাড়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকলাম। কারণ, নিজের ইচ্ছা ছাড়া একদিনে বাদ দিয়ে দেয়া সব মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। তবে হ্যা, আমার বিশেষ অনুরোধে বন্ধুটি একদিন মদ কম খেয়েছে।

প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করতেন, গতদিনে বেশি কথা বলায় আমার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না? এর জন্য যে আমাকে প্রায়ই বকা খেতে হতো তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

অতিরিক্ত বুদ্ধির জন্য প্রথমবার দেখা করতে এসেও দেখা হয়নি। তবে দ্বিতীয়বার ঠিকই দেখা হয়েছে। অবাক হয়ে বন্ধুটি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

প্রায়ই আমাকে বকা খেতে হতো, তাই কথা বলার সময় বদল করলেন। অনেক উপদেশ এবং সহমর্মিতা পেয়েছি তার কাছে। এর জন্য ধন্যবাদ।

এদিকে জানলাম বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির উচ্চ পদস্থ নারীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। আমি যে জেনেছি তা কখনো বন্ধুটিকে বুঝতে দিইনি। ওই সব নারীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তার লাভের পরিমাণটা নিজেই জানতেন। তবে কোনো নারীর প্রতি তার যে কোনোরূপ বিশ্বাস ছিল না তার ওই একটা কথাতেই বুঝতাম। যে কোনো নারীর উদ্দেশে প্রায়ই বলতেন, ইশ! একেবারে দুধে ধোয়া তুলসী পাতা!

যিনি একদিন কথা না বলে থাকতে পারতেন না তিনি কথা বলা কমিয়ে ফেললেন আমার বকা খেতে হয় এ জন্য।

সেই বন্ধুর দেয়া সুন্দর এবং সর্বশেষ উপদেশ আজও মনে আছে এবং থাকবেও সব সময়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নারী জাতির প্রতি একদিন বন্ধুটির ভুল ভাঙবেই এবং তিনি ফিরে আসবেন। বন্ধু, আপনি ঠিকই ফিরে এসেছিল আগের সেই মানসিকতা নিয়ে এবং আমি তখন আগের মতোই ছিলাম। কিন্তু আপনাকে বুঝতে দিইনি। কারণ, আসল তুলসী পাতার জন্য আপনাকে কাঠখড় পোড়াতে হবে।

একদিন আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আলোর পথে ফিরে আসতে। আজও অনুরোধ করছি, ফিরে আসুন বন্ধু, প্লিজ! মানুষ ইচ্ছা করলে কি না পারে? আমি জানি, আপনি পারবেন। সবার ভালোবাসা থাকবে আপনার জন্য।

ঢাকা থেকে

ধ্রুবতারা

– নয়ন আহমেদ

তার নাম সামিয়া লোদি। তবে প্রথম পরিচয়ে সে তার নাম বলেছে অনন্যা। আর আমি তার নাম দিয়েছিলাম ধ্রুবতারা। এবং মাঝে মধ্যে তাকে দুষ্টুমি করে ডাকতাম *মহারানী* বলে। কারণ সে জানিয়েছিল যে, সে নাকি দিল্লির সম্রাট ইব্রাহিম লোদির অধস্তন বংশধর। তাই বংশ নিয়ে তার গর্বেরও যেন শেষ নেই। অসম্ভব এক আবেগী মানুষ সে। সামান্যতেই সে রেগে একেবারে টং হয়ে যেতো। তার এই ছেলেমি দেখে ইচ্ছা করেই তাকে খেপাতাম। এ বালখিল্যতাই কাল হয়ে দাড়ায় আমার জীবনে।

একজন বন্ধু হিসেবেই সে আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রবেশ করে এবং অতি অল্প সময়ে আমার হৃদয়, মন সবটাই দখল করে নেয়। যখন কিছু বলার সময় এলো তখন সে ফুড়ুৎ। আমি যদি লালন হতাম তবে অবশ্যই গাইতাম *পাখি কেমনে আসে যায়। আমি ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়।*

কিন্তু আমি লালন নই, নই কোনো কবি–সাহিত্যিক কিংবা গুণীলোক। তাই তাকে ধরে রাখার মতো কোনো ডোরা নেই আমার হাতে। আছে শুধু হারানোর বেদনা আর না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস। সেই বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসকে সম্বল করে পথ চলি এখনো। কবিগুরু হয়তো আমার সেই বেদনা উপলব্ধি করেই গেয়েছিলেন, *যদি তোর ডাকে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে।* কবিগুরুর সেই বাণীকে গাইড মনে করে সুদূর মরুভূমির এই দেশে অসহ্য তাপদাহ এবং বার সূর্যের তাপ মাথায় নিয়ে পথ চলছি। জানি না আমার এই পথ চলা কবে ফুরাবে?

বেশি দিনের কথা নয়। চলতি সালের আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক সাঝের বেলায় দুবাই–এর একমাত্র বাঙালি মালিকানাধীন আল ইত্তেফাক নিউজ এজেন্সিতে বসে সাংবাদিক বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং *সাপ্তাহিক ২০০০*–এর পাতা উল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে আমার চোখ আটকে যায়। সেখানে লেখা ছিল রিং স্টোন (আসলে হবে রিং টোন) *চাই – আনান।* শেষে তার ইমেইল আইডি দেয়া ছিল, কিন্তু ইমেইল–এর মধ্যখানে আন্ডারস্কোপ এর জায়গায় ছিল হাইফেন।

যেহেতু ইন্টারনেট নিয়ে ঘাটাঘাটি করি সেহেতু আসল আইডি কি হবে তা বুঝতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সেখান থেকে আইডি টুকলিফাই করে পরদিন অফিসে এসে বিসমিল্লাহ বলে দিলাম একটা মেইল করে। জানতে চাইলাম, আপনার নাম কি মিস কফি আনান নাকি টি আনান? আর কোন রিং টোনই বা আপনার প্রয়োজন?

এই সংক্ষিপ্ত মেসেজ লিখে জানলাম, আপনার ঠিক কোন রিং টোনটি প্রয়োজন তা যদি আমার মোবাইল নাম্বার ০০৯৭১-৫০-৭৮৭৪৪০ এসএমএস করে জানান তাহলে চেষ্টা করবো আপনার কাঙ্ক্ষিত রিং টোনটি পাঠাতে, থ্যাংকস, নয়ন।

সকালে মেইল করলাম আর লেগে গেলাম পেটের ধান্দায়। কাজের চাপে ভুলেই গেলাম কখন কি মেইল করেছি। কাজ শেষে আড্ডা দিয়ে হাড়ি পাতিলের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে খেয়ে দেয়ে যে, মাত্র বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি ঠিক সে সময় *মোবাইল* বেজে উঠলো পি পি করে। ১৮ আগস্ট প্রথম প্রহরে (বাংলাদেশ সময় ০০:৫৬:০২ টায়)।

তিনি লিখলেন, মাই নেম ইজ অনন্যা। হ্যাভ ইউ হার্ড দি সং সাথিয়া (হিন্দি)? আই ওয়ান্ট দ্যাট মিউজিক। মে আই আসক ইউ এ কোয়েশ্চন? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? হাউ ইজ লাইফ? থ্যাংকস, বাই।

বলে কি এই মেয়ে? ঘুমের কোলে ঢলে পড়া এই আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখার মতো দুই চোখ মেলে রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে আবার পড়লাম তার পাঠানো এসএমএসটি।

বিনয়াবনত হয়ে জবাব দিলাম, ওয়াও আপনার নামটা তো বেশ সুন্দর! জি না, সাথিয়া গানটি আমি শুনিনি। বাট, আমি চেষ্টা করবো সেটি আপনাকে পাঠাতে। হ্যা আপনি একটা কেন, হাজারটা প্রশ্ন করতে পারেন যেহেতু আমি জাতিগতভাবে বাঙালি এবং পাসপোর্টে আমার পরিচয় বাংলাদেশি। সো, আপনি বুঝতেই পারছেন, অন্য ভাষা না বুঝলেও কম বেশি বাংলা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।

হাউ ইজ লাইফ-এর উত্তরে লিখলাম, জীবনানন্দ দাসের ভাষায় -

এইতো জীবন
পাওয়া আর হারানোর
তবু হাত বাড়ানোর
আশা আর নিরাশার কাঁটার দহন।

তাকে আরো লিখলাম, আপনার কাছে এমন একটি গান পাঠাচ্ছি যেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গান যা আমার মোবাইলে সেট করাই আছে। তা হচ্ছে, আমার প্রাণপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত, *আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।*

এরপর তার কাছ থেকে বন্ধুত্বের অফার পেলাম। সে শর্ত ছিল, ওনলি ফ্রেন্ডশিপ, অন্য কিছু না।

বললাম, যদি ওনলি ফ্রেন্ডশিপ হয়, দেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আরো বললাম, ত্রিশ বছরে পা দিয়ে এ বয়সে অন্য কিছু করার সময় ও সুযোগ আমার কোনোটাই নেই। সো ডোন্ট ওয়ারি। আমি এই সম্পর্ককে অন্য কোনোদিকে মোড় নিতে দেবো না।

সেই থেকে শুরু।

গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ঠ চাতক পাখি যেমন এক ফোটা বৃষ্টির জন্য অধীন আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতো তেমনি গ্রীষ্মপ্রধান দুবাই-এর তপ্ত জমিনে আমিও দিন-ক্ষণ অতিক্রম করতাম তার মেইল বা এসএমএস-এর আশায়। তবে এসএমএস থেকে ই-মেইল পেলেই বেশি খুশি হতাম। দিনের ১৮ ঘণ্টা কমপিউটার অন রাখতাম কখন তার ইমেইল আসে সঙ্গে সঙ্গে তা পড়ার জন্য।

সন্ধ্যা ছয়টার পর যাকে রশি দিয়ে বেধেও আর অফিসে রাখা যেতো সেই আমি এখন রাত আট, নয়, দশটা পর্যন্ত দিব্যি অফিসে বসে থাকি তার মেইল–এর উত্তর লিখতে। সেও খুব সুন্দর লিখতো। লম্বা মেইল করতো। কিন্তু তার মেইল পড়ে আমার তৃষ্ণা মিটতো না। তাই অনুযোগ করতাম, প্রিয় মহারানী, প্লিজ! আরেকটু লম্বা লেখার চেষ্টা করো।

আর আমি তার পুরো মেইল, প্রতিটি বাক্যের, এমনকি প্রতিটি শব্দের উত্তর দিতাম। সে আমাকে খুব বিশ্বাস করতো। তাই তার জীবন কোষের প্রতিটি পাতা আমার সামনে মেলে ধরতো। জানাতো তার সুখ–দুঃখের নানান কাহিনী। আত্মীয়তার সুবাদে এক নিকটজন এবং বন্ধুত্বের সুবাদে এক দূরের মানুষ থেকে প্রতারিত হয়ে সে গোটা পুরুষ জাতির ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। পুরুষ জাতির উপর তার প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং হতাশা লক্ষ্য করতাম সব সময়। এ জন্য আমার অতি উর্বর মস্তিষ্ক নিঃসৃত *গবেট মার্কা* উত্তর দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতাম। লেখাপড়াসহ নানান কাজে উৎসাহত দিতাম। সন্দেহ নেই, আমার মেইল ও এসএমএস তাকে যুগপৎ উৎসাহিত করতো।

সে জানিয়েছিল, নয়ন! আপনি আমার শেষ বিশ্বাস। প্লিজ! আপনি আমার বিশ্বাস ভাঙবেন না।

তার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি সৎ থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবো এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের এ নির্দোষ সম্পর্ক রাখবো।

তাকে কোনোদিন দেখিনি, সেও আমাকে দেখেনি। এমনকি আমরা কেউ–ই কারো ফটো পর্যন্ত চাইনি। এতদসত্ত্বেও চার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে অতি অল্প সময়ে আমাদের মাঝে গড়ে ওঠে এক নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কাছ দুরের আমার অনেক বন্ধুর মাঝে সে হয়ে উঠলো মধ্যমণি, ঠিক যেন লক্ষ কোটি তারার মেলায় ধ্রুবতারা। এই স্বল্প সময়েও আমাদের মান অভিমান চলতো সমান তালে দেখা যেতো, সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে এসএমএস পাঠাতো প্রচণ্ড অভিমান ভরে যেন আমি মহা অপরাধ করেছি।

অপরাধটা কি? বেশি কিছু না।

রাতে তাকে ভুলে এসএমএস করে *গুডনাইট* বলা হয়নি! আহা! কতো বড় অপরাধ।

আর তার সেই অভিমান ভাঙাতে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কমসে কম তিনটি এসএমএস করে কলস কলস তৈল মর্দন করতে হতো। এ রকম ভুল যাতে আর না করি তার জন্য মরুভূমির তপ্তবালুতে দাড়িয়ে কান ধরে একশবার উঠ–বস করতে হতো। তবেই মহারানীর অভিমান ভাঙতো এবং আমি মার্জনা পেতাম। তার এ সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে মাঝে মধ্যে আমারও রাগ হতো। কিন্তু আমার রাগটা হতো একেবারে *জলবৎ তরলং*। মানে এই আছে, এই নেই।

তারপরও সে বুঝতে পারতো। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার উদ্ভাসিত সেই পুরনো পদ্ধতি *তেল মারা* আরম্ভ করতো। বিখ্যাত লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার *তৈল* প্রবন্ধে মেয়েলোকের তৈল দেয়ার যে গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন, এটার বাস্তব প্রমাণ পেতাম তার কথায়। মেয়েলোকের তৈল পেলে আমি কেন, পৃথিবীর যে কোনো কঠিন বস্তুও গলতে বাধ্য। তার এ তৈল পেয়ে আমি আর মর্ত্যে থাকি না, মনের ভেতর তেরো কিসিমের ডানা মেলে আকাশে উড়ি, খুশিতে আমার একেবারে বাকবাকুম অবস্থা।

কিন্তু সে সুখ আমার কপালে বেশি দিন সইলো না। এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় রাগ, ক্ষোভ, দুঃখে সামিয়া সকল প্রকার যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। আর *হাবাগোবা* এই আমি দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গেলাম। হাসতে ভুলে গেলাম চিরদিনের জন্য। হৃদয়ে শুরু হয় প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ। মস্তিষ্কের যে সেলগুলোতে তার স্মৃতির অ্যালবাম সংরক্ষিত ছিল তা সংক্রামক ব্যাধির মতো সবটাই গ্রাস করে চলেছে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে চোখের কোণ দুটি ভিজে যায়। তখন হৃদয়তন্ত্রীতে শুরু হয় চিনচিনে ব্যথা, মাথায় শুরু হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা।

কখনো বা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় তখন ছাদে উঠে নির্মল আকাশের তারা গুণি। খালি চোখে চার হাজারেরও বেশি তারা গুণেছি সত্য। কিন্তু কোথাও ধ্রুবতারাকে দেখি না। তখন বাধ ভাঙা জোয়ার নামে দুই চোখে। তপ্ত অশ্রুর বন্যায় ভেসে যায় সারা মুখমণ্ডল। হৃদয়, মনে একটু শান্তি আসে। আধো ঘুম আধো চেতনে বাকি রাতটা ছাদেই কাটাই।

এক সময় আকাশ-বাতাস প্লাবিত করে ভেসে আসে মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠ। আল্লাহু আকবর। আল্লাহ মহান...নামাজের দিকে আসো, সাফল্যের পথে আগুয়ান হও, ঘুম থেকে নামাজ উত্তম সুবহে সাদিকের নূরি হাওয়ায় সত্যিই হৃদয়-মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। আর তখন মনে হয়, আমিই বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

পেটের তাগিদে সুদূর প্রবাসে আবার কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ি। কিন্তু ঠিক ঘড়ির কাটার আটটায় যখন কমপিউটারের সামনে বসি তখন আবার মনে পড়ে তার কথা। আতি-পাতি করে তার মেইল খুজি। কিন্তু না, তার কোনো মেইল আসেনি। অশ্রুতে আবার ভরে ওঠে দুই চোখের কোণ।

কলিগরা এসে জিজ্ঞাসা করেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড নয়ন, এভরিথিং ইজ ওকে?

জোর করে মুখে বানোয়াট হাসি টেনে বলি, ইয়েস ওকে।

কিন্তু ভেতরটা তখন পুকুরের মাছ ডাঙায় উঠালে যে রকম তড়পায়, ঠিক সেভাবে তড়পাতে থাকে।

ওয়ায়ের, আতিক, কৃষ্ণা, মারিয়া সবাই মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজ নিজ কাজে।

কেউ না কেউ আবার উঠে আসে সান্ত্বনা দেয়, ফিকার মাত করো ইয়ার, সব ঠিক হো যায়ে গা।

কিন্তু সব আর ঠিক হয় কোথায়? কখনো মারিয়া এসে কান টেনে বলে, *আনতে হেমার ওয়াহেদ* এর বাংলা অর্থ দাড়ায়, *তুই আস্ত একটা গাধা।*

আসলে কি তাই? জানি না।

অনেক দিন তার এসএমএস কিংবা মেইল আসে না। অনেক অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা চেয়ে তাকে ইমেইল করেছি। সারা রাত জেগে অনেক এসএমএস-ও করেছি। কান ধরে উঠ-বস করার রেঞ্জ একশ থেকে বাড়িয়ে এক হাজারে উন্নীত করেছি। তন্ত্র-মন্ত্র যা কিছু জানি তাও অ্যাপ্লাই করেছি। অন্য বন্ধুদের মধ্যে যারা খুব ক্লোজড তাদেরও সহায়তা নিয়েছি। কিন্তু এবার কিছুতেই মহারানীর অভিমান ভাঙছে না। মনে হয় ইচ্ছা করেই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা।

একবার না পারিলে দেখ শতবার। শতবার কেন, আমি হাজারবার দেখবো, লক্ষবার চেষ্টা করবো মহারানীর অভিমান ভাঙতে। প্রয়োজনে সারা জীবন চেষ্টা করবো, লক্ষ তারার মাঝে হারিয়ে যাওয়া আমার ধ্রুবতারাকে খুজে বের করবোই ইনশাআল্লাহ।

ইউএই থেকে
nayon73@hotmail.com

৩১টি বড়ি

– এ.কে.এম সালাহউদ্দীন

মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যা তার ভবিষ্যৎ জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এসব ঘটনা কারো জন্য মঙ্গল আবার কারো জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে। আমি যে ঘটনা লিখতে যাচ্ছি তা আমার জন্য অমঙ্গল না মঙ্গলের তা জানি না। তবে এ ঘটনা যে আমাকে প্রেম করা থেকে বিরত রেখেছে তা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

কৈশোরের উদ্দাম, উচ্ছল দিনগুলোতে শ্লীল, অশ্লীল নানান রকম পত্রিকা পড়ে ও বয়সে বড় বন্ধুদের কাছ থেকে যৌন বিষয়ক গল্প শুনে মনের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতাম। বন্ধুদের প্রেমের গল্প, প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা, নানান রোমাঞ্চের কথা শুনে বুকের মধ্যে চিনচিন করে উঠতো। মনে মনে ভাবতাম, ইশ! আমারও যদি একজন প্রেয়সী থাকতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো।

হাফেজি মাদ্রাসার বিরতিহীন পড়াশোনা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রত্যেহ আসর থেকে মাগরিব এবং সপ্তাহান্তে একদিন ছুটির সময়কে গোল্ডেন অপরচুনিটি হিসেবে নানান বয়সের মেয়েদের দেখা ও তৎসম্পর্কে আলোচনায় ব্যস্ত থাকতাম। দুপুরবেলায় আমাদের মাদ্রাসা-মক্তব চালু থাকায় আশপাশের এলাকা থেকে অনেক ছেলেমেয়ে পড়তে আসতো। আমাদের লক্ষ্য থাকতো মেয়েদের দিকে। কে বেশি সুন্দরী, কার বাবা কতো ভালো চাকরি করেন ইত্যাদি দেখে আমাদের অনেকেই বিভিন্ন মেয়ের কাছে আকারে-ইঙ্গিতে প্রেমের প্রস্তাব দিতো। চোখাচোখি ও হাসি বিনিময়ই ছিল সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। কথা বলা বা নিভৃতে সাক্ষাৎ ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

একদিন হঠাৎ মেয়েদের দিকে তাকিয়েছি। দেখি একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মনের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করলাম। আরো দুই তিন দিন একই অবস্থা থেকে বন্ধু কাদেরকে ব্যাপারটা জানালাম। সে ছিল আমাদের প্রেম বিশেষজ্ঞ।

সে বললো, কয়েকদিন অপেক্ষা কর, পরিস্থিতি কি দাড়ায়, তারপর ব্যবস্থা নেবো।

আমার বাসায় যাওয়ার পথে হিরাদের বাসা হওয়ায় প্রায়ই দেখতাম সে তাদের বাসার বাইরে ঘোরাঘুরি করছে এবং আমাকে দেখে হাসছে।

একদিন দুপুরে খাওয়ার জন্য বাসায় যাচ্ছি। পেছন থেকে হিরার বান্ধবী জুলেখা বলছে, পণ্ডিতমশাই শোনেন, আপনার সঙ্গে হিরা কিছু কথা বলবে।

আমার তখন অবস্থা খারাপ। না জানি কি বলবে! যদি ভালোবাসার কথা বলে, যদি জানতে চায় আমি তাকে ভালোবাসি কি না তাহলে কি জবাব দেবো ইত্যাদি নানান চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

অথচ সে সহজভাবে বললো, আপনারা কয় ভাইবোন, আপনি কতো নাম্বার, কোথায় থাকেন ইত্যাদি।

আমি কোনো রকম জবাব দিয়ে বিদায় নিলাম।

কয়েকদিন পর জুলেখা আমার হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিল।

বাসায় এসে সন্তর্পণে পড়ে দেখি হিরা লিখেছে, পণ্ডিতমশাই, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। সারা রাত আপনার কথা ভেবে ঘুম আসে না। আপনাকে দেখার জন্য সারা বিকেল বাইরে বসে থাকি, আপনি কি কিছুই বোঝেন না? সঙ্গে একটি গানও লিখেছে। *তোমারই ভাবনায় আসে না ঘুম, ওই রাত যতই হোক নিঝুম।*

বন্ধুদের পরামর্শে শুরু করলাম প্রেমের ইনিংস। চিঠি দেয়া-নেয়া হতে লাগলো।

একদিন হঠাৎ করে দুই বান্ধবীসহ সে আমাদের বাসায় হাজির। আমি তো ধরা পড়ার ভয়ে অস্থির।

যাহোক, কোনো রকম মাকে ম্যানেজ করলেও ছোট বোনের হাতে ঠিকই ধরা খেলাম। সে বললো, ভাইয়া, ওই মেয়েটা দেখছি তোর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে। তা তোরা কি প্রেম করছিস নাকি?

লোকে বলে প্রেমে পড়লে নাকি মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। একদিন সাহস করে তাদের বাসায় গিয়ে চিঠি দিয়ে মনে হলো তার মা মনে হয় দেখে ফেলেছেন। দুঃশ্চিন্তায় আমার পড়াশোনা খারাপ হতে লাগলো। আমার আশংকাই সত্যি হলো।

একদিন রাতে তার বাবা চিঠিসহ মাদ্রাসায় হাজির। ভাগ্যিস সেদিন হুজুর ছিলেন না। নানান রকম উপদেশ এবং শেষে কিছুটা হুমকি দিয়ে বললেন, হিরা তোমাকে যেসব চিঠি দিয়েছে তা নিয়ে আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করবে।

চিঠি দেখার পর ফেরত দেয়া হবে শর্তে সরল বিশ্বাসে হিরার দেয়া চিঠিগুলো তার বাবার হাতে তুলে দিলাম। চিঠি হস্তগত করে তার রূপ পাল্টে গেল। আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে নানান রকম হুমকি দিলেন এবং হুজুরকে বলে দেবেন তাও জানালেন।

হুজুরকে জানালে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার ও বাসার সবাই জেনে যাবে এই চিন্তায় আমার নাওয়া-খাওয়া, ঘুম বন্ধ হয়ে গেল।

হুজুর দুই দিন পরেই রাতের বেলা কাদেরসহ আমাকে ডাকলেন।

আমি তো ভয়ে অস্থির।

হুজুর হেসে হেসে বললেন, কি রে, তুই বলে প্রেম করিস। তা কি জন্য শুনি? তুই কি তাকে বিয়ে করবি?

আমি বললাম, হ্যা। আজও জানি না সেদিন কেন হ্যা বলেছিলাম। মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন হুজুর। অন্যরা প্রতিদিন বেত্রাঘাত খেলেও আমি মার খেতাম খুবই কম।

পরের দিন সবার পড়া বন্ধ করে আমার বিচার শুরু হলো।

ঘটনার আদ্যপান্ত শুনে হুজুর অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। আগের দিন আনা কাচা কঞ্চি দিয়ে শুরু করলেন মার। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একের পর এক আঘাত হানতে লাগলেন আমার দেহে। বললেন, প্রেম করিস, প্রেমের ভূত আজ ছুটিয়ে দেবো।

অনেক কাকুতি-মিনতির পর যখন হুজুর থামলেন ততোক্ষণে আমার শরীরের নানান স্থানের চামড়া উঠে রক্ত ঝরা শুরু হয়েছে। সেদিন বুঝেছিলাম প্রেম করা কতো কঠিন।

এক সহপাঠী গুণে দেখেছিল। আমাকে সেদিন ৩১টি বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। সেদিনের ৩১টি বেতের বড়ি (বাড়ি) খেয়ে প্রেমের ভূত সেই যে পালিয়েছে, দীর্ঘ বারো বছর পর আজও তা আমাকে আছর করতে পারেনি।

ইসলামপুর, রাজশাহী থেকে

পতেঙ্গা

– মোহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন হৃদয়

প্রেম হলো অন্ধ এক তাল গাছের মতো। সে কখন কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তা কেউ বলতে পারে না। এই আমিও কখনো ভাবিনি যে, আমার উদ্দেশ্যহীন জীবন কেউ এসে আলোকিত করে দেবে। কিন্তু নদী তা-ই করেছিল।

একদিন বললাম, চলো, পতেঙ্গা সি বিচ থেকে বেড়িয়ে আসি।

আমার তীব্র অনুরোধের কাছে তার স্বভাবসুলভ না হেরে গেল।

সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে আমি আর নদী সাগরের কুল ঘেষে হাটছিলাম বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে। এলোমেলো পাথরে পা ফেলতে নদীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ সে পড়ে যাচ্ছিল দেখে হাত বাড়ালাম। অমনি নদী আমার হাতে ধরলো। অভিমানের সুরে সে বললো, হৃদয়, আমি আর হাটতে পারছি না। চলো কোথাও গিয়ে বসি।

ক্লান্ত দুজনেই গিয়ে বসলাম সাগর পাড়ের অনতিদূরের বট গাছের নিচে সবুজ ঘাসে। বিকেলের পড়ন্তবেলায় ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় মুগ্ধ চোখে ঘুরছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে। আমি বললাম, নদী, তোমারও কি ইচ্ছা করে না তাদের মতো কাউকে ভালোবাসতে, মনের ভাব প্রকাশ করতে?

নদী বললো, ইচ্ছে তো অনেক কিছুই করে। কিন্তু সব ইচ্ছা কি পূরণ হয়?

দেখো নদী, চাওয়ার মাত্রা যদি সীমাবদ্ধ হয় তবে সেটা অবশ্যই পূরণ হয়?

হৃদয়, তুমি কি আজও বুঝতে পারছো না, এই নদী কাকে চায়?

নদীর চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। নদীর দিকে আমার দুহাত বাড়িয়ে দিতেই নদী আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কপাল, চোখ, মুখে পাগলের মতো অজস্র চুমু দিয়ে ভরিয়ে দিতে লাগলো।

এই অবস্থায় আমিও সেদিন মুহূর্তের মধ্যেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম।

নদীকে নিয়ে আমার অনুভূতিতে ছোয়া লাগে, পতেঙ্গায় দিনটি কেটেছিল খুবই আনন্দে। সাগরের নীল জলে, লোনা পানিতে হাতে হাত ধরে হাটা, নিবিড় সান্নিধ্যে ছবি ওঠানো, কথা বলা, কথা না বলা...।

এভাবে দুজনের জীবন যখন প্রেমের আনন্দ আর ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে পথ চলছিল তখনই প্রকৃত সমস্যাটি আমাদের জীবনে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাড়ালো...। কারণ, নদী, আমার প্রেয়সী হিন্দু!

নদী অবশ্য মাঝে মধ্যে বলে আমি হিন্দু হয়েছি তো কি হয়েছে? প্রেম কোনো জাত, কুল, ধর্ম মানে না, আমার অন্তর জুড়ে যদি কারো ছবি থেকে থাকে তাহলে সেটা শুধু তোমারই ছবি। মৃত্যুর আগপর্যন্ত যদি কাউকে ভালোবাসতেই হয় তবে শুধু তোমাকেই ভালোবাসবো। তুমি শুধু আমার প্রতি এটুকু বিশ্বাস রেখো। প্রেমের শপথ খেয়ে বলছি, ঠকবে না।

নদীর এব স্ট্রেইটকাট কথা শুনে অভিভূত হয়ে সরাসরি তার সত্যবাদী চোখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকি।

দিন চলে যাচ্ছে... সেই সঙ্গে কেন যেন নদীকে হারানোর ভয় প্রতিনিয়ত আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। নদী কি এই পতেঙ্গার মতো সমুদ্রে এসে বিলীন হয়ে যাবে?

সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম থেকে

বিদেশিনী

– মোহাম্মদ শহীদুল কায়সার লিমন

ইন্টারনেটে চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। পাচ ফিট পাচ ইঞ্চি লম্বা অষ্টাদশী ইভান। বাঙালি মেয়েরা সহজে প্রকৃত বয়স বলতে না চাইলেও বিদেশিরা অকপটেই বলে ফেলে। আমি তাকে ইভ বলেই ডাকি।

ইভ–এর চেহারা দেখলে যে কোনো পুরুষই দুবার তাকাতে বাধ্য হবে। ঠিক যেন স্বর্গের দেবী। আমার মন্তব্য অবশ্য তার ছবি দেখে। আমেরিকার হার্ভার্ডে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতো ইভ। ইভের বাবা ফরাশি, মা আমেরিকান। দুজনেই বর্তমানে আমেরিকা থাকেন। বাবা ব্যবসায়ী, মা চাকরিজীবী।

আমার অবস্থা বলার মতো তেমন নয়। ঢাকার জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি কলেজে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে অধ্যয়নরত যাকে অনেকে *জগা বাবুর পাঠশালা* বলে মন্তব্য করে থাকেন। বাবা কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ী। মা গৃহিণী ও শিক্ষিকা।

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করে দিতাম কথা বলে। প্রতিদিন আমাদের কথা হতো ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এছাড়া আমরা সেলুলার ফোনেও প্রচুর সময় কথা বলতাম। আমাকে জন্মদিনে সেলফোন উপহার দিয়েছিল ইভ।

এক সময়ে আমরা একে অপরকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

ইভ মনে হয় আমাকে একটু বেশি পছন্দ করতো। সে বাংলা শিখতে চাইলো এবং আমাদের দেশে আসার কথা প্রায়ই বলতো।

তাকে বাংলা শেখাতে শুরু করলাম। তবে সে সময় দেশে আসার ব্যাপারে সায় দিতাম না।

সে এক সময় আমাকে আমেরিকা যাবার কথা বললো। কিন্তু আমার পক্ষে কি করে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের যা আর্থিক অবস্থা। তাই ইভকে সে কথা বলে আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিলাম।

কিছুদিন পর ইভ জানালো সে আমার আমেরিকা যাওয়ার সব ব্যবস্থা করবে এবং আর্থিক দিকটাও সেই দেখবে।

আমি না করলাম।

কিন্তু সে আমার কথা শুনলো না। আমাকে প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্রের কথা বললো এবং শিগগিরই পাঠাতে বললো।

আমি তা-ই করলাম।

প্রায় পাচ মাস সময়ের মধ্যেই ভিসা পাবার সব ব্যবস্থা ইভের সহায়তায় হয়ে গেল। এমবাসি থেকে ভিসা পেয়ে গেলাম।

ইভ জানালো যে, আমাদের দেশে আসবে, কিছুদিন ঘুরে দেখবে, তারপর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

তার আসার পরবর্তী সব ব্যবস্থা করে রাখলাম।

ইভের আসার চার দিন আগে থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। তার ইমেইলে জরুরি বার্তা পাঠানোর পরও কোনো উত্তর পেলাম না। সেলুলারে চেষ্টা করলাম। সেখানেও ব্যর্থ হলাম। কেউ ফোন রিসিভ করছে না। এভাবে কাটলো দুটো দিন।

ইভের যেদিন আসার কথা তার আগের দিন শুনলাম সেই ভয়াবহ দুঃসংবাদটা।

ইভের বাবারই এক ব্যবসায়ী পার্টনার তার বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক বিরোধের জের ধরে ইভ-কে বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণের পর হত্যা করে।

খবরটি শুনে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। দুদিন কোনো কথা বলতে পারিনি। আমাকে এক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এরপর সুস্থ হয়ে আমার আমেরিকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলাম। অনেকে হয়তো বলবেন, আমি কতো বোকা! কি ভুলটাই না করেছি।

কিন্তু আমি জানি, কোনো ভুল করিনি। যেখানে আমার ইভ নেই সেখানে গিয়ে কি লাভ! আমি তো আর ধন-দৌলত পেতে আমেরিকা যেতে চাইনি? যেতে চেয়েছিলাম আমার ইভকে পাওয়ার জন্য।

শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে

অভিনেত্রী

সে ছিল ক্লাসমেট। ক্লাস সিক্স থেকে নাইন। তারপর ক্লাস টেন-এ এসে কাহিনীর সূত্রপাত। দুজন একই স্যারের কাছে পড়তাম। ওই স্যার ছিলেন তার কাকা। কিছুদিন পর তার আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। উল্লেখ্য যে, স্যারের বাসা থেকে এক কিলোমিটার দূরে মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতাম।

আমার আসতে দেরি হলে সে চুপ করে বসে থাকতো। কোনো দিন চাচার ধমক খেয়ে দুই একটা অংক যদি করতো তাহলে আমি এলে ওই অংক সে আমার খাতায় আগে করে দিতো। ফ্যান চললেও সে খাতা দিয়ে বাতাস দিতো। অকারণে হাসতো, চিমটি দিতো, এমনই আরো ছোটখাটো অনেক কিছু হতো।

এভাবে যতো দিন যায়, তার দুর্বলতাও ততো প্রকাশ পেতে থাকে। একদিন স্কুলে বা পড়তে না এলে সে আমার মামাতো ভাইসহ ওই গ্রামের যারা স্কুলে আসতো তাদের সবার কাছে জানতে চাইতো আমি অসুস্থ কি না। পরের দিন পড়তে এলে অভিমানের সুরে বলতো কাল কেন পড়তে আসোনি?

তাকে না দেখলে আমারও কেমন যেন খারাপ লাগতো। কিন্তু তাকে তা বুঝতে না দিয়ে বরং এড়িয়ে চলতাম। কারণ আমি জানতাম এটা পারিবারিকভাবে অসম্ভব। তাছাড়া মনে হতো এটা তার বিলাসিতা। কেননা আমার চাইতে অনেক ভালো ছেলেও তার কাছে পাত্তা পায়নি। তাই তাকে এড়িয়ে চলার জন্যই তার চাচার কাছে পড়া ছেড়ে দিলাম। স্কুলে দেখা হলেও কথা বলতাম না। লক্ষ্য করতাম, ক্লাসে সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিয়তির কাছে মানুষ অসহায়। তাই ধরা পড়লাম তার কাছে ১৯৯৫ সালের ১৬ আগস্টে। সে স্কুলের একটা নির্জন রুমে আমার হাত ধরে বললো, আই লাভ ইউ।

তাকে অনেক বোঝালাম। বিজ্ঞ বক্তার মতো বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চাইলাম যে, আমি তার সঙ্গে মিশতে পারবো না।

কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইলো না।

অবশেষে দুজন ভেসে চললাম প্রেমের স্রোতে।

এসএসসি পাসের পর সে ভর্তি হলো যশোর সরকারি মহিলা কলেজে। আর আমি তারই পরামর্শে সরকারি এমএম কলেজে। এখন আমরা অনেকটা স্বাধীন। এখন আমাদের প্রায়ই দেখা হয়, ক্লাস ফাকি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। পৌর পার্কে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করি। মাঝে মাঝে চিঠি দেয়।

এভাবেই চলছিল। হঠাৎ চার পাচ মাস তার কোনো খবর নেই। ভাবলাম তার ঘোর কেটে গেছে। চিঠিতে লিখলাম, *আমার এ ভালোবাসা জানি গো তোমার ...*।

চিঠি পেয়ে ছুটে এলো সে। আদরে আদরে আমার সব অভিমান ভুলিয়ে দিল। বললো, এতো চিন্তা কেন তোমার? আমাকে হারাবে না। আমি তোমারই আছি, তোমারই থাকবো।

প্রতি বছর ১৬ আগস্ট প্রেম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাকে গিফট দিতাম, সেও দিতো। এরই মাঝে দুজন একই কলেজে অনার্সে ভর্তি হলাম। এখন আমাদের প্রতিদিন দেখা হয়। মাঝে মধ্যে সে বাড়ি থেকে এটা-ওটা নিয়ে আসে আমাকে খাওয়ানোর জন্য।

একদিন বকুল ফুলের একটা মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো, জানো! আজ ভোরে উঠে আমার স্বামীর জন্য মানে তোমার জন্য ফুল কুড়িয়ে খুব যত্ন করে এই মালাটা গেথেছি।

এভাবেই চলছিল। হঠাৎ প্রায় দুই মাস সে কলেজে আসে না, চিঠিও দেয় না। বন্ধু শ্যামলকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে জানলাম তার বিয়ে ঠিক হয়েছে অন্যত্র।

পর পর কয়েকটা চিঠি দিলাম। সে যেন অবশ্যই দেখা করে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। জানতে পারলাম বিয়েটা তার পছন্দেই হচ্ছে এবং ওই ছেলেকে সে আগে থেকে চিনতো।

সত্যতা যাচাই করার জন্য বিয়ের তিন দিন আগে তাদের বাড়িতে গেলাম।

সে বললো, আমাদের সম্পর্কের কথাটা বাড়ির সবাই জেনে গেছে এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে। সে আরো বললো, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে একা বাইরে যেতে দিচ্ছে না। তবুও কাল চেষ্টা করবো।

সে এলো না। বরং লাল বেনারসি জড়িয়ে বধূবেশে চলে গেল বাগেরহাটে। সে আমার সব স্বপ্ন, বিশ্বাস আর ভালোবাসার কবর রচনা করলো।

ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু হলো না। তার বিয়ের আঠারো দিন পর অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিতে এসে দেখি আমার পাশেই তার সিট। যদিও আমাদের সাবজেক্ট ছিল ভিন্ন। এই প্রথম দেখলাম সে নাকে অলংকার আর বোরখার নিচে শাড়ি পরেছে।

চার ঘণ্টা বসে থেকেও কিছুই লিখতে পারলাম না। অথচ সে লিখেই চলেছে। এভাবেই পরীক্ষাগুলো শেষ হলো।

পরীক্ষার শেষ দিন সে আমাকে জোর করেই নিয়ে গেল পার্কে। পার্কে বসে নিজের হাতে অনেক কিছু খাওয়ালো। তার আচরণে ভুলে গেলাম আজ সে অন্যের স্ত্রী। অনেক দিন পর কাছে পেয়ে মনে হলো সে আরো বেশি সুন্দর হয়েছে এবং আমার প্রতি তার দুর্বলতা আরো বেড়ে গেছে।

তারপর সে তার শ্বশুরবাড়ির গল্প শুরু করলো। বলতে বলতে হঠাৎ কাদতে আরম্ভ করলো। আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাদলো। এরপর কান্না থামিয়ে যা বললো তার সারমর্ম হলো, তার শ্বশুরবাড়ির সবাই খুব ভালোবাসে তাকে শুধু তার স্বামী ছাড়া। কেননা তার স্বামী অন্য মেয়েকে পছন্দ করে। তার স্বামী নাকি তার এক বন্ধুর পছন্দের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যই তাকে বিয়ে করেছে। তাছাড়া তার স্বামীর নাকি টাক আছে। বয়স তার চেয়ে দ্বিগুণ। তার সঙ্গে ফৃ হতে পারছে না ইত্যাদি কারণে স্বামীকে তার পছন্দ হয়নি। এখন সে আবার ফিরে আসতে চায়।

তাকে বোঝালাম, এখন তোমার সঙ্গে দুটো পরিবারের সম্মান জড়িত। তুমি ফিরে যাও।

সে অনুরোধ করলো, আমি যেন তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু রাখি।

বলেছি, তাও সম্ভব নয়। তবুও সে এসেছে অনেকবার, পার্কে গেছে। চিঠি দিয়েছে। আমার সঙ্গে ছবি তুলেছে...।

অনেক দিন হলো সে কোনো যোগাযোগ করেনি। এখন শুধু মনে হয় সব ছিল তার অভিনয়। একজন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো সে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছে। আবার মনে হয়, অভিনয় কি এতো নিখুত হয়?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, যশোর থেকে

ধন্যবাদ

– রানা

সময়টা ছিল ১৯৯৬–এর শুরুর দিকে। এসএসসি পাস করে আমাদের এলাকার একটা সরকারি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে ভর্তি হই। প্রথম দিন ক্লাস করতে যখন ক্লাসরুমে ঢুকি তখন সামনের সারিতে তিনটি এবং পরের সারিতে দুটি মেয়ে বসে থাকতে দেখি। সবাই মোটামুটি সুন্দরী। কিন্তু একজনকে আমার কাছে আলাদা রকমের ভালো লাগলো। পরে জেনেছি মেয়েটির নাম মিঙ্কি।

এভাবে এক সময় মিঙ্কির জন্য মনে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসা তৈরি হলো। কিন্তু আমার ভালোবাসার কথা মিঙ্কিকে জানানোর সাহস পাচ্ছিলাম না।

আস্তে আস্তে ক্লাসের প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল। আমার অন্যান্য বান্ধবীর সঙ্গে ফৃভাবে কথা বলতে পারলেও মিঙ্কির সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পারতাম না।

মিঙ্কির প্রতি আমার দুর্বলতা আমার বান্ধবীরা টের পেয়েছিল। এমনকি মিঙ্কিও বুঝতে পেরেছিল।

আমি আবার সেই সময় নোট ম্যানেজ করে পড়তাম।

এটা কিভাবে যেন মিঙ্কি জানতে পারে।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম মিঙ্কি যেন ইশারায় বা কথার ছলে আমাকে কি যেন বলতে চায়।

এদিকে আমার মনের কথা যে মিঙ্কিকে বলবো সেই সাহসটাও পাচ্ছি না। সারাক্ষণ চিন্তা করার ফলে আমার ঠিকমতো পড়াশোনা হতো না।

এভাবে দিন যেতে যেতে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম।

সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর মিঙ্কি একদিন আমাকে বিকাল চারটায় কলেজে দেখা করতে বলে।

ভাবলাম পড়াশোনা নিয়ে কথা বলবে। বিকাল চারটায় কলেজে গেলাম।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখলাম রিকশায় চড়ে মিঙ্কি আসছে।

মিঙ্কিকে বললাম, কি কথা বলবে বলো।

মিঙ্কি বললো, রানা, তোমার অন্যান্য বান্ধবীর সঙ্গে তুমি বেশি মিশবে না।

বললাম, কেন?

ও বললো, তোমাকে অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখলে সহ্য করতে পারি না। উল্লেখ্য, আমার ক্লাসের অন্যান্য বান্ধবীর সঙ্গে আমি খুবই ফ্রভাবে মিশতাম। বান্ধবীরাও তাই।

যাই হোক। তারপর বললাম, দেখো মিঙ্কি, তুমিও আমার বান্ধবী, অন্যরাও তাই।

তখন মিঙ্কি বললো, আমি কিছু বুঝি না, তোমাকে নিষেধ করলাম। তুমি মিশবে না।

মিঙ্কির এ কথাতেই আরো স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে, মিঙ্কি আমাকে ভালোবাসে। মনে মনে চিন্তা করলাম, ফাইনাল পরীক্ষা শেষে আমার ভালোবাসার কথা মিঙ্কিকে বলবো। আমি মিঙ্কিকে নিয়ে স্বপ্নের ঘর সাজালাম। সামনে পরীক্ষা। তাই সবাই পড়াশোনা নিয়ে যখন ব্যস্ত তখন মিঙ্কির চিন্তায় আমি বিভোর। পড়ার টেবিলে বসলেই চোখের সামনে মিঙ্কির হাসি ভাসে, পড়তে পারি না। কতো যে শীতের রাতে সাইকেল চালিয়ে মিঙ্কির রুমের সামনের রাস্তা দিয়ে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

এভাবে দিন যেতে যেতে পরীক্ষা চলে এলো। মোটামুটিভাবে পরীক্ষা শেষ করলাম।

শেষ পরীক্ষার দিন মিঙ্কি আমাকে বললো, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য অংক করতে হবে, কিন্তু টিচার খুজে পাচ্ছি না। রানা, তুমি কি আমাকে একটা টিচার খুজে দেবে?

বললাম, ঠিক আছে।

খাওয়া-দাওয়া ভুলে টিচার খুজতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পর শামীম নামের এক সিনিয়র ভাইকে খুজে পেলাম। তারপর একদিন শামীমভাইয়ের সঙ্গে মিঙ্কিকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। শামীমভাইয়ের কাছে মিঙ্কি প্রাইভেট পড়া শুরু করলো।

আমি কোচিং করতে ঢাকা চলে গেলাম।

দেড় মাস পর বাসায় ফিরে এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনলাম যে, মিঙ্কি আর শামীমভাই নাকি প্রায়ই এক সঙ্গে বেড়াতে যায়।

কথাটা শুনে মাথায় রক্ত ওঠে গেল। শামীমভাইকে মারবো এমন প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

তখন আমার এক বন্ধু বললো, রানা তোর ভালোবাসার কথাটা মিঙ্কিকে জানিয়ে দেখ কি হয়।

অনেক দিন অপেক্ষার পর একদিন রাস্তায় মিঙ্কিকে পেয়ে গেলাম। মিঙ্কিকে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, একটু এদিকে এসো।

প্রথমে সম্মতি দিচ্ছিল না। তারপর বললো, বলো কি বলবে?

বললাম, মিঙ্কি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার মতামত জানতে চাই।

মিঙ্কি বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি না। আমি অন্য একজনকে পছন্দ করি।

এ কথা শোনার পর মনে হচ্ছিল যে, আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তুমি যাকে ভালোবাসো তার নামটা বলো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, শামীমভাই।

আরেকবার ধাক্কা খেলাম। মিল্কি চলে গেল। পলকহীন চোখে ওর চলে যাওয়া দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কলেজ জীবনের মুহূর্তগুলো। মিল্কি কেন এমন করলো বুঝতে পারলাম না।

একদিন আমার অন্য বান্ধবী বললো, কলেজ জীবনে তোর মূল্যবান নোটগুলো নেয়ার জন্য তোর সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছে মিল্কি। আরো বললো, নিজের স্বার্থে মিল্কি অনেক কিছুই করতে পারে।

এ কথা শোনার পর চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। জীবনটা অন্য রকম হয়ে গেল। এতো বড় ঝড় এসে এভাবে আমার জীবন এলোমেলো করে দেবে বুঝতে পারিনি। নিজের ভালোবাসার মানুষকে না পাওয়ার জ্বালা সইতে না পেরে এক সময় ফেনসিডিল খাওয়া ধরলাম। আস্তে আস্তে তা নিয়মে পরিণত হলো।

মা-বাবার চাপাচাপিতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলেও কোথাও চান্স পাইনি কারণ, পড়াশোনা করতে পারিনি। চান্স না পাওয়াতে আমার বাবা-মা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়রা অবাক হয়ে যান। কেননা তারা জানতেন, আমার মেধা সম্বন্ধে। এসএসসি ও এইচএসসি-তে ভাল মার্কস থাকা সত্ত্বেও কেন ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম না এ কথা বার বার আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন।

কোনো উত্তর দিতে পারি না। আমার নেশা করাটা পরিবারসহ অন্যান্য আত্মীয়রাও জেনে যান। তারা আমাকে এখন ধিক্কার দেন।

কিন্তু আমার কষ্টটা কাউকেই বলতে পারি না। অথচ এই আমি ছোটকাল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পর্যন্ত একটা ভালো, সুবোধ বালক হিসেবে পরিচিত ছিলাম। কোথা থেকে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না।

মিল্কি এখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। আর আমার শিক্ষা জীবন নেই বললেই চলে। মিল্কিই আমাকে ভালোবাসার পথ তৈরি করে দিয়েছিল। অথচ সেই নিজের প্রয়োজনে এই পথ থেকে সরে গিয়েছে। মিল্কি এমন এক পথে আমায় ঠেলে দিয়েছে যেখানে শুধু আছে কষ্ট, ধিক্কার এবং অবহেলা। এখন বাবা-মার চোখে নষ্ট ছেলে হিসেবে আমি পরিচিত।

ভালোবাসা নাকি মানুষকে শান্তি দেয়। এ কথা মানায় মিল্কি আর শামীমের জন্য। তবুও সেই ভালোবাসাকে ধন্যবাদ। কারণ, ভালোবাসা এইচএসসি থেকে শুরু করে ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত আমাকে সুখের সাগরে ভাসিয়েছিল।

কোটচাদপুর, ঝিনাইদহ থেকে

গল্পগুচ্ছ

– হাসান তারিক

পাগলের প্রেম

স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে ঢুকলাম এক নতুন, অচেনা পরিবেশে। বাংলা সিনেমার বদৌলতে কলেজ জীবন নিয়ে ধারণা জন্মেছিল, কলেজ হচ্ছে প্রেমের বিদ্যাপীঠ।

সেই বিদ্যাপীঠের ছাত্র হবার দুর্নিবার আকর্ষণে হঠাৎ করেই ভালো লেগে গেল নাহরিন নামের মিষ্টি মেয়েটিকে। ওর মায়াবী চোখ দুটোতে যেন দীঘির টলটলে জলের ঢেউ। আর সেই ঢেউই আমার বুকে প্রেমের ঝড় তুললো। এবং সে ঝড় থামাতেই একদিন তার মুখোমুখি হলাম দ্বিধাগ্রস্ত মনে, ভীরু হৃদয়ে।

চোখাচোখি হলো আমাদের। আমি তার মায়াবী সৌন্দর্যতায় বেশিক্ষণ চোখে চোখ রাখতে পারিনি। মাথা নিচু করে অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর...।

জবাবে নাসরিন মুচকি আর রহস্যময়ী হাসি হেসে বললো পাগল...।

পরদিন থেকে কলেজে নতুন নামে পরিচিত হলাম। আর মুখে মুখে রটে গেল পাগলের প্রেমের উপাখ্যান। এরপর প্রেম... ফানুস হয়ে গেল!

নিয়তি

ইন্টারমিডিয়েট টেস্ট পরীক্ষার পর *চিটাগাং সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স* নামে একটি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হই। পড়ালেখার প্রচুর চাপ, কয়দিন বাদেই এইচএসসি পরীক্ষা।

এমনই ব্যস্ত সময়ে পারভীন নামের এক শাদাসিধে মেয়েকে ভীষণ ভালো লেগে গেল। মেকআপহীন মুখশ্রীতে কেমন যেন মায়া মমতা! তা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। সকালবেলা সদ্যস্নান করে যখন সে ক্লাসে উপস্থিত হতো তখন মনে হতো শিশির ভেজা শিউলি ফুল।

একদিন মুখোমুখি হলাম দোতলার ব্যালকনিতে। তুমি কি জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি? আমার ভীরু হৃদয়ের সরাসরি প্রশ্ন।

তার ছোট উত্তর, জানি।

তার উত্তরে বিস্মিত হই। জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে জানো?

তোমার চোখ দেখে।

ভালোবাসার আকুলতায় আবেগী কণ্ঠে বলি, আমার কথার জবাবে তুমি কিছু বলবে না?

সে উত্তর দেয় নরম কণ্ঠে 'সুমু, আমিও তোমাকে খুব পছন্দ করি, কিন্তু...। সে থেমে যায়।

কিন্তু কি?

ইতস্তত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। পরীক্ষার পরই আমার বিয়ে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো প্লিজ!

তার শেষ কথাটি ছিল আর্দ্রতায় জড়ানো। তাকে পাওয়া হলো না আমার।

বলা হয়নি

বাসার সামনেই এসে রিকশাটা থেমে যায়। খানিকটা কৌতূহলী হয়ে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি, দোতলার বারান্দায় মানবীর এক জোড়া চোখ আমারই দিকে তাকিয়ে আছে।

পাশাপাশি বাসা আমাদের। মাঝে মধ্যে দরজা খুলতেই দেখা হয়ে যায়। নরম কণ্ঠে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছেন সুমুভাইয়া?

আমি নিচু চোখে জবাব দিতাম, কলেজে।

বারান্দায় বসে আছি একা। এমন সময় সে হঠাৎই হাজির। কোনো রাখঢাক ছাড়াই সেই ষোড়শী মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, আমাকে আপনি এতো লজ্জা পান কেন?

অসম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জবাব দেই, কই না তো!

একদিন কলেজে যাবার জন্য রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছি।

এমন সময় সে এলো।

খালি রিকশা পেয়ে তাতে চেপে বসতেই পেছন থেকে ডাক পড়লো, এই যে শুনুন?

কি ব্যাপার?

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে তার জবাব, *কোনো রিকশা পাচ্ছি না, আপনি কি আমাকে একটু...!*

একই রিকশায় দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। দুজনেই চুপচাপ। আমি যতোটা সম্ভব চেপে বসে আছি একপাশে। দৃষ্টি আমার সামনে।

শুনুন... /

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। গভীর কালো কিন্তু জলের মতো স্বচ্ছ চোখ তার।

কিছু বলবে... ?

মুচকি হেসে তার জবাব, না... কিছু না...।

এমনি করে সময় বয়ে গেছে।

আজ ওরা চলে যাচ্ছে। বিদায়বেলায় দেখা হলো।

আমরা চলে যাচ্ছি... / ওর কণ্ঠ ভেজা।

শুকনো হাসি হেসে বলি, *ভালো থেকো*।

ওর দিকে তাকাই। চোখাচোখি হয়। আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি, চোখ দুটো তার জলে টলমল করছে। তবে কি লাবণী নামের ষোড়শী এই মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে? এতো গভীরভাবে ভালোবাসে! আমার কেন জানি, ভীষণ মায়া হচ্ছে মেয়েটির প্রতি।

কতো সময় পার হয়ে গেছে, অথচ কেউ কাউকে কখনো, কোনোদিনও বলিনি ভালোবাসি।

ধর্মের দেয়াল

বন্ধু–বান্ধবহীন প্রায় নিঃসঙ্গ প্রকৃতির মানুষ আমি। কোলাহল হই হুল্লোড় এড়িয়ে চলি। কেন জানি, এসব আমাকে আকর্ষণ করতে পারে না মোটেই।

ইউনিভার্সিটি জীবনের প্রথম দিকে আমার এ নিঃসঙ্গতা প্রকট আকার ধারণ করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার ছোয়ায় আমার একান্ত নিঃসঙ্গতা যেন ধীরে ধীরে কর্পূরের মতো উড়ে যাচ্ছিল। এবং সেটাই তার প্রতি আমার আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

তার হাসি, তার কথা–বার্তা, আচার–আচরণ সবই আমার বিষণ্ন মনটাকে মুহূর্তেই সারিয়ে তুলতো। সে কারণেই বোধহয় মুখ ফুটে কখনো এ কথাগুলো বলা হয়নি। বুঝেও হয়তো বা না বোঝার ভান করেছি আমরা দুজনেই।

এতো পাশাপাশি, কাছাকাছি থাকার পরও তার আর আমার মাঝে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল ছিল। সে দেয়াল ভেঙে আমরা কখনো বেরিয়ে আসতে পারিনি। সে দেয়ালের নাম ধর্ম। ধর্মের দেয়ালের এপারে আমি মুসলিম, ওপারে সে হিন্দু।

আমাদের সংকীর্ণ সমাজ হয়তো আমাদের মেনে নিতো না। অবশ্য আমরাও এ সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করিনি ভয়ে।

তিন বছর পর সেদিন *সুমি ধর*–এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। অনেক কথার মাঝে আমাকে সে একটা প্রশ্ন করেছিল। সত্যি করে একটা কথা বলবে?

কি কথা? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তুমি কি আমাকে কখনো ভালোবেসেছিলে?

ওর কথার উত্তর দিতে পারিনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলাম।

আমার নীরবতায় হয়তো সুমি উত্তরটা বুঝে নিয়েছিল।

পাপড়ি

পাপড়ি নামের মেয়েটিকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিনই বুকের মাঝে একটা অন্য রকম অনুভূতি টের পেলাম। বুঝতে পারলাম, আমার সামথিং হ্যাজ হ্যাপেনড জাতীয় কিছু একটা বোধহয় শুরু হলো। অথচ

এতোবার অপ্রাপ্তির পর এ রকম হবার কথা ছিল না। কিন্তু তার হরিণী চোখের কোমল দৃষ্টি, রহস্যময় মুচকি হাসির বদৌলতে নিজের হৃদয়টা আমার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করলো।
অবশেষে বিশ্বাসঘাতক হৃদয়ের গোলামে পরিণত হলাম। মনের মাঝে এখন ভালোবাসার আকুলি বিকুলি। *সখী কবে তোমায় পাবো* টাইপের স্বরচিত কবিতা লিখে খাতা ভর্তি করি ভালোবাসার *কাঙাল* হয়ে।
আর তো পরাণে সয়না *পরাণে সয়না* অবস্থাটি যখন চরমে ঠাই নিল তখন আমিও পাপড়ির সামনে গিয়ে দাড়ালাম। নরম ও বিগলিত কণ্ঠে আমার ভালোবাসার কথা জানালাম।
তার জবাবে পাপড়ির মতো কোমল মেয়ের হরিণী চোখের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হলো কালনাগিনীর দৃষ্টি।
সে দৃষ্টিতে ভালোবাসায় নয়, ভয়ে ভস্ম হয়ে গেলাম।
তারপর...। তারপরে কর্মটির স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে *বীরাঙ্গনা* উপাদিতে ভূষিত করা যায়।
তার পাশে রাখা ফুল নয়, কাঠের ফুলদানিটি উড়ে এলো আমার দিকে তার হস্ত নিক্ষেপে তার মহৎ কর্মটি ছিল এটাই।
কোনোমতে সরে গা বাচালাম। বুঝলাম, মেয়েটি পেশাদার পিকেটার না হলেও *শৌখিন* হিসেবে মন্দ না! মানসম্মান আর না হারানোর ভয়ে দৌড়ে দ্রুত পালালাম।
আমি থিসিস করলাম *সামথিং ইজ রং... ।*

কয়েকটি চিঠি

আমি পত্রিকায় টুকটাক লেখালেখি করি। তারই কল্যাণে আমার লেখার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ডজন খানেক চিঠি আমার ঠিকানায় পৌছেছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, এদের সবাই-ই মেয়ে।
গাইবান্ধার গোন্দিগঞ্জের মেয়ে সিথি তার লেখা প্রথম চিঠিতেই *তুমি* সম্বোধন করে বন্ধুত্ব করতে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে চাদপুরের মতলব থানার *মতলববাজ কন্যা* রাশেদা আহ্বান করেছে, আপনার যদি প্রেমিকা না থাকে কিংবা আপনি যদি অবিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমার সঙ্গে...।
সিলেটের শাহিদা জামান প্রবাসী প্রেমিক জামানের শোক ভুলতে আমাকে *ট্যাবলেট* হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে। এমন অবস্থা সীতাকুণ্ডের বিবাহিত মুনিয়ারও। জাপান প্রবাসী স্বামীর আদর-সোহাগ বঞ্চিতা আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল বন্ধুত্বের থালা নিয়ে। এ রকম অনেক কথা, অনেক প্যাচাল। কিন্তু তাদের মনোবাসনা আমার দিয়ে পূরণ হয়নি। এ জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কারণ, আমি বিনা কষ্টে *কেষ্ট* লাভ করতে অনাগ্রহী।

এবং...

জীবনের গল্পগুচ্ছের শেষাংশে এসে আজও একা রয়ে গেছি। কাউকে কাছে পাওয়া হয়নি আমার একান্তভাবে। ধর্মের দেয়াল, না বলা কথা, হেয়ালি কিংবা নিয়তির দোষে প্রেম সাগরের অমৃত পান করিনি। তারপরও আশাহত নই, প্রতীক্ষায় আছি। আমার ভালোবাসার অলংকার হয়ে কেউ না কেউ, কোনো একদিন অবশ্যই আমার সামনে এসে দাড়াবে। আমি সেই সময় এবং তার প্রতীক্ষায়ই এখন আছি।

নতুনপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে
hasantarique 20@yahoo.com